এভাবেই এগোয়

জয়ন্ত জোয়ারদার

পরিবেশক
বুক মার্ক
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ/অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রচ্ছদ/ও. সি. গাঙ্গুলি ও কল্যাণ মাইতি

প্রকাশক/অনিল আচার্য

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

পি ৫৫ বি, সি, আই, টি, রোড, কলকাতা-১০

ছেপেছেন/শ্রী মুদ্রণালয়,

বিনোদ সাহা লেন, কলকাতা

প্রকাশকের কথা

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম ভারতের এতাবৎ কাল প্রচলিত সমস্ত মূল্যবোধের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে আমাদের চারপাশের চেনা জানা বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের টাল মাটাল বিস্ফোরণের বারুদ হাতে নিয়েছিল। বাঙালী মধ্যবিত্ত ছেলেরা জন্ম ছাত্ররাজনীতি চাকুরি বিবাহ মৃত্যুর কারাগারের চেনা ছক ভেঙে কেরিয়ার ও খ্যাতির মুখে পদাঘাত করে বিদ্রোহ গড়ার কাজে আত্মোৎসর্গ করল।

এমন একজন বাঙালী মধ্যবিত্ত নেই যিনি এমন ছেলে একজনকেও অন্ততঃ না চেনেন। কিন্তু এ ছেলেদের ভাবমানস আমাদের কজনের চেনা? নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় আবেগে থর থর এ যুগের প্রেক্ষাপটে খ্যাত অখ্যাত অনেক লেখকই অনেক কিছু লিখেছেন। নিরাপদ দূরত্বে বসে থেকে দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখে বিপ্লবভীরু ভাড়াটে লেখকের দল এই আন্দোলনকে হেয় করার জন্যই এই পরিপ্রেক্ষিত বেছে নিয়েছেন। সেখানে মূল চরিত্রগুলো পরিণতিতে নপুংসক নির্জীব এবং বিকৃত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তার পাশাপাশি অন্য কয়েকজন বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত শুধু এই সৎচেতনার ওপর দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের গভীরে না গিয়ে অজ্ঞানতার দূরত্বকে কল্পনার মিশেল দিয়ে পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। এই ধারার দু এক জনের লেখায় individual anger এর পরিণতি individual annihilation এ, violence ও কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছে। আশা করবো তাঁরা সত্তর দশকের বিপ্লবী রাজনীতি আরো গভীর ভাবে অনুধাবন করবেন।

ব্যতিক্রম স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো,' শংকর বসুর 'কমুনিস' ও আলোচ্য উপন্যাস। 'গ্রামে চলো' এক বিশেষ সময়ের বিপ্লবী ভাবমানসের ফসল। নকশালবাড়ির রাজনীতির স্বপক্ষে প্রথম সোচ্চার সাহিত্য কর্ম। 'কমুনিস' কলকাতার দামাল দিনগুলোর বস্তুনিষ্ঠ ছবি। 'এভাবেই এগোয়' এই যুগের এক সামগ্রিক ছবি। 'গ্রামে চলো' বা 'কমুনিসে' রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছে যাদের প্রভাব ও বিচরণ সমগ্র উপন্যাসে। 'এভাবেই এগোয়' তে তেমন কোন গগনচুম্বী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত। সমস্ত চরিত্র মিলে এক সংবদ্ধ জীবন। তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা আশা অনুভূতি এখানে অনেক বেশী জীবন্ত। বর্তমান উপন্যাসে মতাদর্শ গত দ্বন্দ্বসংঘাত বাস্তবকে চিত্রায়িত করার স্বার্থেই

উৎসারিত হয়, বিশেষ কোন গোষ্ঠীর বক্তব্যকে বৃহত্তর ভূমিতে দাঁড় করানোর জন্য নয়। রচনাশৈলির কসরৎ কোন সময়েই বক্তব্যকে ডিঙোনোর চেষ্টা করে না। সহজ সরল ভাবে চরিত্রগুলি বর্দ্ধিত হয়, বাঁক নেয় পরিণতির মোহনার দিকে। ব্যক্তিগত প্রেম মেলে দেশপ্রেমের সঙ্গে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের অরাজনৈতিক মেয়ে মিনুর চেতনার উত্তরণের সঙ্গে পাঠকেরও ভাবমানস আন্দোলিত হয়। 'নকশালপন্থী' বিপ্লবীদের আত্মত্যাগে আমরাও উদ্বুদ্ধ হই, তাদের আত্মানুসন্ধানে আমরাও শরিক হয়ে পড়ি। এভাবেই জয়ন্ত জোয়ারদার সফল তাঁর উপন্যাসে, যা আমাদের চিন্তার খোরাক জোগায়, চেতনাকে এগোয়।

'অনুষ্টুপ' পত্রিকার দ্বাদশ-বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর পুস্তিকাকারে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত এই সংস্করণ প্রকাশিত হল। মুদ্রণ প্রমাদের বাহুল্য থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। সংশোধনী দিয়ে ত্রুটি স্খালনের চেষ্টা করেছি।

এই উপন্যাসটি প্রকাশের ক্ষেত্রে রঞ্জিৎ সাহা, অসিত চক্রবর্তী ও জয়ন্ত চৌধুরির ও অন্যান্য অনেকের সহযোগীতা পেয়েছি। তাঁরা সবাই ধন্যবাদার্হ।

এভাবেই এগোয়

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	লাইন	যা আছে	যা হবে
৩	১৪	কনসলিটেশন	কনসলিডেশন
৬	৯ এবং ১০		একটানা চলবে
১৪	১৫	তুলে দেন	তুলে নেয়
২৪	১০	জেলা সংগঠন কমিটি	জেলা সংগঠনী কমিটি
৩৩	২৪	বৌয়ের	বিয়ের
৪০	১৮	লড়াই	(শব্দটা) বাদ যাবে
৫০	২১	ভাব	ভাল
৫৯	৫	ততটা	অতটা
৬৯	৮	কদিন ধরে যে	কদিন যে
৬৪	২৫	আর	আবার
৬৫	১৯	তাকাল	তাকান
৭৮	৩	কথাগুলোর	কথাগুলোয়
৮৪	১৭	ভারতবর্ষে	ভারতবর্ষ
৯১	৭	পারেনি মিন্টু,	পারেনি, মিন্টু
৯৩	১০	অশোকের	অশোকদের
৯৬	৩	জিতুর	টুডুর

তিমির, পরিতোষ, সুদীপ্ত
ও অন্য শহীদ বন্ধুদের অমর স্মৃতিতে

জয়ন্ত জোয়ারদার সম্পাদিত চীনের
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গল্প (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

১

চৈত্র শেষের জ্বালাধরানো হল্কা বাতাসটা থেমে গেছে। নদী-নালা-গাছ-পাথরে লেগেছে রাতের আমেজ। সন্ধ্যের ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া একটু উকিঝুঁকি দিয়েই আবার লুকিয়েছে। গুমোট গরম। গাছে কচি সজনেগুলো ঝুলে আছে, যেন ফাঁসিতে লটকে দিয়েছে। কোথাও একটা পাতাও নড়ছে না। মিনু একমনে পড়ছে। মাঝে মাঝে হাত পাখাটা নাড়ছে।

—বাসনগুলো তাড়াতাড়ি মেজে ফেল্, মা। রাত অনেক হল। পিঠের ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করেন নিবারণবাবু—তোর পরীক্ষাও তো পরশু থেকেই নারে? দেখ্, একটু চটপট সেরে নে।

—হুঁ, উঠ্ছি বাবা।

মিনু এবার স্কুল ফাইন্যাল দেবে। পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর। কীরকম যেন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে সব ভুলে যাচ্ছে। আর ভালও লাগছে না পড়তে। লণ্ঠনটা বারান্দায় রেখে বাসনগুলো নিয়ে কুয়োতলায় বসে মিনু। গলির ল্যাম্পপোস্টের আলো সজনে গাছটার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে। সারা পাড়াটা চুপচাপ। ঠিক এই সময়টায় কিচ্ছু ভাল লাগে না ওর।

নিবারণবাবু দাওয়ায় বসে বিড়িতে শেষ কটা টান দিতে থাকেন। কপালটাই মন্দ। এত লোকে তো সংসার করে, কই ঘরের বউ শয্যাশায়ী, এমন তো আর কারুর নয়। মেয়েটাকে পরীক্ষার আগে ঘরের সব কাজ সামলাতে হচ্ছে। শুধু কী স্ত্রী অসুস্থ! কপাল মন্দ না হলে আর দেশ ভাগ হয়। কানসাটে সামান্য কিছু জমিজমা ছিল। ম্যাট্রিকও পাশ করেছিলেন, তাই চাকরীও করতেন। মোটামুটি স্বচ্ছলই ছিলেন বলা যায়। এপারে এসে কোন মতে কেরানীগিরি যদি বা জুটল, কিন্তু জমি তো আর সঙ্গে বেঁধে আনা যায় নি। বউ-ছেলের হাত ধরে চলে এলেন। তারপর থেকেই অভাব আর অভাব। ছেলেটা ম্যাট্রিক অব্দিই পৌছোল না। ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে শেষে কিনা লরি ড্রাইভারের সাকরেদ। বিনা মাইনের ক্লিনার। নিজেরটা হয়ে যায়। কিন্তু এই এতগুলো মুখের যে কী করে দুবেলা জোটানো যায়। হে প্রভু, মুক্তি দাও।

বাসনগুলো তক্তপোষের নীচে ঢুকিয়ে রেখে দড়িতে টাঙানো গামছায় হাত-মুখ মুছে নেয় মিনু। লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রেখে সংস্কৃত বই খুলে বসে। এ-ঘরে

বাবার দরজায় খিল দেবার শব্দ শোনে। নাড়ু, সন্তু, খোকন এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্তুটা আবার ঘুমের মধ্যে কী সব বকবক করে—সেণ্টার হাফ··· বল দে···গোল গোল। নিজের মনেই হেসে ওঠে মিনু। সামনের কুণ্ডুদের বাড়ির দোতালার টিউব লাইটটা নিভল। ও বাড়ির সমীর ছোঁড়াটা বেজায় অসভ্য। ছ'চোখ দিয়ে যেন গিলে খায়। আর ভাল লাগছে না পড়তে। থাক এখন, কাল খুব ভোরে উঠবে। বইটা বন্ধ করে, মশারী টাঙায়। লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

কাল পুড়াটুলি যেতে হবে। সবিতার দাদার কলকাতা থেকে সাজেশন আনার কথা। মিনুর ভীষণ ভয় করে—যদি পাশ না করতে পারে। এই পড়া নিয়েই কি কম ঝামেলা হয়েছে? ও যখন নাইনে পড়ে, তখন মার হার্ট অ্যাটাক হল। বাবা স্কুলে যেতে বারণ করে দিল। এমনিতেই পয়সাকড়ির টানাটানি, তার ওপর মা অসুস্থ। সংসারের দেখাশোনা করবে কে? সেদিন মিনুর খুব কান্না পেয়েছিল। পড়তে ওর ভাল লাগে না, পড়াশোনাতে ভালও না। তবু স্কুলে যেতে ওর ভাল লাগত—কীরকম যেন একটা নেশা আছে, একটা মুক্তির স্বাদ। ইস্, মিনু পাশ না করতে পারলে দীপুরও খুব মন খারাপ হবে। কতই বা মাইনে পায়। তিনজনের সংসার খরচ চালিয়ে আবার মিনুর পড়ার খরচ। বইপত্তর, স্কুলের মাইনে। পাশ করতে পারবে না? মিনু পাশ করলে দীপুর মাও খুব খুশী হবে। মিনুর ভীষণ লজ্জা করে। জেঠিমাকে কী করে পরে মা বলে ডাকবে। বোকা বোকা। লজ্জারই বা কী আছে, দীপু তো আর ওদের নিকট আত্মীয় নয়। কেমন যেন একটা লতায়পাতায় সম্পর্ক। বাব্বাঃ কটা বাজলো—কটা ঘণ্টা—সাত আট—নয় দশ—এগারো বারো, বারোটা। নাঃ, ঘুমোতে হবে। কাল ভোরে উঠে ইংরেজীটা পড়বে। প্রথম দিন বাংলা—মোটামুটি হয়েছে। ইংরেজীটা নিয়েই ভয়। দীপুও ভাল ইংরেজী জানে না। ও খুব ভাল। কিন্তু প্রেসের কম্পোজের কাজ ছাড়া ও কিছুই জানে না। দীপু সোমবার আসবে। দীপুর কথা ভাবতে ভাবতে মিনু ঘুমিয়ে পড়ে।

২

গৌতম উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। মনে মনে যে-স্বপ্ন সংকল্পে পরিণত হচ্ছিল, তা সত্যি হতে চলেছে। বাস থেকে নেমে ঘড়ি দেখে

ও—একটু আগেই পৌঁছে গেছে। রাত্রি প্রায় দশটা। এক প্যাকেট চারমিনার কেনে। হঠাৎ মনে হয়, গ্রামের কমরেডরা নিশ্চয় বিড়ি খায়। রাতে যদি দেশলাই ফুরিয়ে যায়—একটা কিনে নেয়। প্রাচী সিনেমার সামনে দাঁড়ায়। এখান থেকেই ওকে স্বপনের শেল্টারে নিয়ে যাবে। স্বপন ওর গ্রামে কাজ করার ইচ্ছেটাকে কীভাবে নেবে? স্বপনের অভিজ্ঞতাগুলো জানতে হবে আগে, ওর তো গ্রামে প্রায় বছরখানেক হল। স্কুলে মাস্টারি নিয়ে চলে গেল মালদাতে। কৃষকদের সঙ্গে থেকে সংগঠিত করবে বলে শহরে চাকরি খুঁজলই না। মাঝে দু-একবার দেখা হয়েছে। তারপর তো শুনেছে যে মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবেই কাজ করছে। আচ্ছা মালদা যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে তো? মেদিনীপুর বা বাঁকুড়াতেও যেতে পারে। প্রেসিডেন্সির ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কিন্তু মেদিনীপুরে নাকি শিগ্‌গীরই লড়াই শুরু হবে। নিজে কিছু না করেই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে? বাঁকুড়াতে যারা আছে তাদের সঙ্গে ঠিক সরাসরি যোগাযোগ নেই। ওদের কন্‌সলিডেশনের এখানকার যাদবপুরের ছেলেদের চেনে। মালদাতে যাওয়াই ভাল, স্বপন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। একেবারে অপরিচিত পৃথিবীতে একজন অন্ততঃ পূর্বপরিচিত লোক থাকলে সুবিধে-অসুবিধের কথা প্রাণ খুলে বলা যাবে। তাছাড়া নকশালবাড়ির সংলগ্ন এলাকা, মুক্তাঞ্চলের স্বপ্ন তো ওদিকেই সত্যি হবে। আবার ঘড়ি দেখে গৌতম। সাড়ে দশটা বাজলো। সামনে একটা ষাঁড় নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে। বাড়িতে ঠিক কীভাবে বলবে ভেবে উঠতে পারছে না। গ্রামে যাবো, কৃষি-বিপ্লবের রাজনীতি প্রচার করতে, স্বপনদের মত। স্বপনকে চেনে বাড়িতে। ভাল ছেলে বলে ইমেজ আছে। পেছন থেকে কে যেন ঘাড়ে হাত রাখে। চমকে ওঠে গৌতম। অন্যমনস্ক চিন্তাস্রোতে ছেদ পড়ে। পীযূষ।

—কী ভাবছিলি এত? আমি এলাম, তোর পাশে দাঁড়ালাম, খেয়ালই করলি না।

—না, এমনি।

সারপেনটাইন লেনে ওরা দুজনে ঢুকে পড়ে। গৌতম কৈফিয়তের সুরে বলে—বুঝছিস তো, যাবো তো ভেবেছি। কিন্তু দ্বিধা, পিছুটানের তো শেষ নেই। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম—গৌতম আরো কথা বলতে যায়। পীযূষ নিষেধ করে। নিঃশব্দে ওরা একটা বাড়িতে ঢোকে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে

দোতলায় ওঠে। পীযূষ দুবার কড়া নাড়ে। দরজা একটু ফাঁক করে এক মহিলার মুখ উঁকি দেয়।

—তুমি। এস।

—বৌদি, তালতলার ছেলেরা চলে গেছে?

—হ্যাঁ। স্বপন তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।

—ওর খাওয়া হয়ে গেছে?

—এই একটু আগে খেয়ে উঠল।

—যাঃ, শেষ ভরসাও গেল।

—কেন? কী হল?

—আর বোলো না। এক জায়গায় মিটিং চলছিল। এদিকে দেরী হয়ে যাবে তাই বাড়ি গিয়ে আর খেয়ে আসা হয় নি।

—ও এই। আমার খাওয়াতো হয় নি।

—না না। একরাত তো।

—কেন, তোমাদের কমরেডদের ছাড়া আর কারুর ভাত বুঝি ভাগ করে খাওয়া যায় না?

বাল্‌বগুলো টিমটিম করে জ্বলছে। চারপাশটা অন্ধকার। পুরোনো আমলের বাড়ির আঁকাবাঁকা বারান্দা। গৌতম পীযূষের পেছনে এগোয়। শেষ মাথায় ছোট্ট ঘরটার দরজার মুখে দাঁড়ায়। স্বপন ধুতিকে লুঙ্গির মত করে পরে, খালি গায়ে, খাটের উপর আধশোয়া হয়ে 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' পড়ছে। বেশ কয়েক দিনের না-কামানো একমুখ দাড়ি। ছাইদানি উপ্‌চে পড়ছে সিগারেটের টুকরোয়। গৌতমের অদ্ভুত ভাল লাগলো ছবিটা। স্বপন উঠে বসে।—আয় আয়। কেমন আছিস?

স্বপন গৌতমের পিঠে হাত রাখে। গৌতম হাতের আবেগের উষ্ণতাটুকু অনুভব করে।

—পীযূষ, মেশিন টুলসের ধর্মঘটের খবর কী রে?

—চলছে। আমাদের শ্রমিকদের মনের জোর, শুরু, সলিড। কিন্তু ইউনিয়নটা তো আমাদের না। বাজে টার্মে সেটেলমেণ্ট করে ফেলতে পারে। আমাদের শ্রমিকদের যা স্পিরিট দেখছি, ইউনিয়ন লিডারদের ধোলাই করে দেবে যেকোনদিন।

—আমি তোদের এখানকার ব্যাপার জানি না। তাই দুম করে কিছু বলা উচিত না। তবে দেখিস, যা করবি সবদিক ভেবে করিস।

—না গুরু, শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা সলিড। ভেবো না শুধু অর্থনৈতিক আন্দোলন করছে। ১লা মে ময়দানে আমাদের এলাকার মিছিলে অন্ততঃ আশি জন শ্রমিক ছিল। শোধনবাদীরা যখন ঝাড়পিট বাধানোর চেষ্টা করছিল তখনও একজনও কেটে পড়ে নি। আর মিটিং শুনে তো দারুণ উৎসাহিত হয়েছে।

বৌদি ঘরে ঢোকেন—খাবে এসো। পীযূষ অস্বস্তির সঙ্গে স্বপনকে বলে—মেসিন টুলসে এত দেরী হয়ে গেল। খানিকটা জবাবদিহি করে। স্বপন এক শেণ্টারের ওপর বেশী অত্যাচার করলে চটে যায়। বৌদি আর পীযূষ বেরিয়ে যায়।

—বল্ এবার তোর খবর।

গৌতম একটু হেসে স্বপনের দিকে তাকায়। তারপর চুপ করে থাকে। কীভাবে বলবে, ভাবে।

—আমাকে নিয়ে চল্।

—সব দিক ভেবেছিস? কৃষকদের মাঝে কিছুদিন থেকে পারছি না বলে পালিয়ে এলে নিজেরও হতাশা বাড়বে, আর কৃষকদের অবিশ্বাস। শারীরিক কষ্টও আছে কিছুটা—প্রায়ই খেতে না-পাওয়া, রোদে-জলে প্রচণ্ড শীতে মাইলের পর মাইল হাঁটা। কৃষকদের সঙ্গে সত্যকার একাত্ম হওয়া দীর্ঘদিনের ব্যাপার।

—শারীরিক কষ্ট, বোধ হয়, সহ্য করতে পারবো।

—নিশ্চয়ই পারবি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগে পুরো প্রশ্নটা ভাব। জীবনধারা আমরা যেভাবে জেনে এসেছি—কলেজ, ছাত্র-আন্দোলন, চাকরি, পারিবারিক কর্তব্য, সংসার—এই পুরো ছকটা একদম বদলে যাবে। একদিনের জন্য নয়—আজীবন কত উত্থান-পতন।

—ভেবেছি। কিন্তু আমাকে দিয়ে হবে কিনা সেটা তুই তোর অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারবি।

—আমাকে দিয়ে হচ্ছে, তুই কেন পারবি না। জানিস এতদিন হল, তবুও মাঝে মাঝে বড় একা একা লাগে। অথচ চারপাশে এত মানুষ। কারণ কী জানিস, আমরা নিজের শ্রেণীর মানুষ খুঁজি, মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছ থেকে হাততালি পেতে চাই। তাই এমনকি গ্রামের কাজের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী—স্কুল মাস্টার, ছাত্র, ভেটিনারি সার্জেন বা মধ্য-কৃষকদের দ্বারা বেশী আকৃষ্ট হই।

—তাতে অসুবিধে কী ? এরাও তো বিপ্লবী শ্রেণী।

—তা ঠিক। কিন্তু আমরা এদের মধ্যেই আটকে যাচ্ছি। ক্ষেত-মজুর বা গরীব চাষীরা মেটিরিয়ালি সারভাইভ করার ব্যাপারে জোতদারদের ওপর আপাতনির্ভরশীল। আর তাই লড়াইয়ে নামতে এরা দ্বিধাগ্রস্ত। আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাকে কাটিয়ে চেষ্টা করতে হবে এদের সংগঠিত করতে। হয়ত বছরের পর বছর কেটে যাবে। দ্রুত সাফল্যের কথা ভাবলেই কৃষকদের সম্পর্কে হতাশা জোগাবে।

—জমিতে উৎপাদনের কাজে যুক্ত হচ্ছিস ?

—না, সেটা হচ্ছে না।

মধ্যবিত্ত কর্মীরা আমাদের ক্ষেত-মজুর কমরেডদের সঙ্গে জোতদার, মহাজনদের জমিতে কাজে গেলেই চিহ্নিত হয়ে পড়ছে। তবে ভাগ চাষ করে বা নিজের কিছু জমি আছে এমন গরীব বা মধ্য-চাষীদের জমিতে নিড়ানি দেওয়া বা ধান কাটায় হাত লাগিয়েছি। তবে এতে মুশকিল হয়, ক্ষেত-মজুরদের সঙ্গে যোগাযোগটা কমে যায়। এখনও আমরা ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে সংগঠন ভাল করে গড়তে পারি নি।

—আমি যাবো কিনা বল ? তোদের ওদিকে তো নাকি আরো কয়েক জনকে নিয়ে যাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ। তুইও যাবি। আমি সবাইকে একটা কথাই বলছি। আবেগের বশে যাবি না। ভাল করে ভাব। দরকার হলে আরো দু চার মাস পরেই যাবি।

— প্রাথমিক পরিচয়টা গ্রামে কীরকম হবে ?

—প্রথম প্রথম বিভিন্ন সূত্রে কিছু গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী ও মধ্য-কৃষকদের যোগাযোগে একটা এলাকায় বসে হয়ত এর ওর দু'চারটে ছেলে পড়িয়ে নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে গরীব চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের। বিনা মাইনের মাস্টার হিসেবে বসেছি দুজন। আমার এলাকার কাছাকাছি একজন গরীব চাষী কমরেডের বাড়িতে আত্মীয় পরিচয়ে বসেছে একজন।

—কীভাবে কী করতে হবে রে ?

—দেখ, এ পর্যায়ে আমরা যা করছি, তা মূলতঃ মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা, বিপ্লবের রাজনীতি প্রচার করা, লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, উদ্যোগী কৃষকদের নিয়ে পার্টি-কমিটি গঠন করা। পার্টি-কমিটির নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের

ফসল বা জমি-দখলের সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা। সংগঠন নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া। আশা করছি, আমরা যদি আরো বেশ কিছু কর্মী পাই, প্রচার সংগঠন ঠিকমত করতে পারি, তাহলে আগামী ফসলের ওপর দখল রাখার জোর লড়াই গড়ে তুলতে পারবো।

—কলকাতায় তো এত ছেলে আছে।

পীযুষ ঘরে ঢোকে। —গুরু একটা সিগ্রেট ছাড় তো। স্বপন প্যাকেট এগিয়ে দেয়। নিজেও একটা ধরায়। পীযুষ শুয়ে পড়ে বলে— শহরের সেরা বিপ্লবীরাই তো গ্রামে যাবে।

স্বপন হেসে ফেলে। —আর ঝুল বিপ্লবীরা শহরে থাকবে? শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়বে কারা? শ্রমিকদের বাদ দিয়ে বিপ্লব করার কথা ভাবছিস না নিশ্চয়ই।

—দেখো গুরু, তাহলে কী আর কলেজ ছেড়ে এই ধ্যাষ্টামি করতাম?

—কাজের কাজই করছিস। শ্রমিক কমরেডরা গ্রামে আসছেন কবে? 'চিং কাং' পড়েছিস তো। শ্রমিকদের শুধু মতাদর্শগত নেতৃত্ব নয়, প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রশ্নটাকে চেয়ারম্যান কত গুরুত্ব দিয়েছেন।

—সবে তো শুরু। আরো কিছু দিন সময় দে।

অজানা পথে পা বাড়ানোর হাজারো কৌতূহল গৌতমের। কত দিন বাদে বাদে নিজেদের মধ্যে দেখা হয় রে?

—কাছাকাছি হোল টাইমারদের দিন পনেরো কুড়ি বাদে গ্রামেই, আর জেলার সবাইকে নিয়ে মাস দেড়েক দুয়েকে একবার বসা হয়।

—বল্ তাহলে, কবে যাবো?

—বেশ, আমি ফিরে যাবার দিন সাতেক বাদে আয়। গিয়ে তোর বসার যোগাযোগটা ঠিক করে ফেলি।

পীযুষ কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। গৌতম ঘড়িতে দেখে প্রায় দেড়টা। স্বপন কাগজে একটা নাম ঠিকানা লিখে গৌতমকে বুঝিয়ে দেয়।— …এমনিতে স্টেশনে লোক থাকবে। যেমন বললাম। আর একটা নাম ঠিক করে ফেল। পুরোনো পরিচয়টা তো মুছে ফেলতে হবে।

—নাম, তুইই বল।

—বেশ সোজা সরল যা হোক একটা।

—অশোক।

—চলতে পারে। উপাধি ?

—মুখার্জী ?

—না না। বামুন মানেই সাধারণ মানুষ থেকে উপরি দূরত্ব। অন্য কিছু। আর আমার ওখানে নাম—জহর, মনে রাখিস্।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দেয় স্বপন। ক্লান্ত ঘুম ঘুম চোখে হাই তোলে।

নে শুয়ে পড়া যাক। কাল ভোরে আবার বেরোতে হবে।

—তুই কোথায় শুবি ?

মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে নেয় স্বপন। পীযূষকে এক পাশে ঠেলে জায়গা করে নেয় গৌতম।

—তোর চট করে ঠাণ্ডা লাগার ধাতটা এখনও আছে ?

কমরেডদের ব্যাক্তিগত খুঁটিনাটি এতও মনে রাখে স্বপন, গৌতমের অবাক লাগে। স্বপনকে ওর নিজের চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ মনে হয়। নিঃশব্দ অন্ধকার। দূরের কোন রাস্তা দিয়ে দমকলের গাড়ি ছুটে গেল ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। ঘুম আসতে চায় না গৌতমের।

স্বপন।

—হুঁ।

—পার্টি তৈরির ব্যাপারটা আগে জানতিস তুই ?

ভাসা-ভাসা শুনেছিলাম। ঠিক জানতাম না।

গৌতমের একটু অবাক লাগে। কলকাতার ছাত্রফ্রণ্ট থেকে গ্রামে গেছে আজ অব্দি জনা সাতেক। তাই এদের প্রত্যেককেই এরা কেউকেটা ভাবে। তারাও পার্টি তৈরির কথা জানতো না!

—কীভাবে খবর পেলি ?

—আমার এলাকায় একটা গঞ্জের হাটে একজন দর্জি আমাদের সমর্থক। ৫/৬ই মে নাগাদ, বোধ হয়, ওর ওখানে গিয়ে শুনি। তারপর কাগজ জোগাড় করে পড়ে বিশ্বাস হল।

পার্টি ওপর থেকে কীভাবে গড়ে ওঠে, গৌতমের ঠিক ধারণা নেই।—আচ্ছা তোর কী মনে হয় একটু তড়িঘড়ি হয়ে গেল ?

—মনে হয় না। শ্রীকাকুলামের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে একটি কেন্দ্র থেকেই সমস্ত সংগ্রাম পরিচালিত হওয়া দরকার। বিপ্লব করতে গেলে

বিপ্লবী-পার্টি গড়তেই হবে। আমরা কো-অর্ডিনেশনের বাইরে ছিলাম। নীচু তলা থেকে পার্টি-গঠনের ভুল রাজনীতি ও সংকীর্ণতাবাদ কাটিয়ে আমরা মার্চ মাসে কো-অর্ডিনেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এ নিয়ে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়, কারণ চীনের পার্টিও আমাদের পার্টি-প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

গৌতম আর কথা বাড়ায় না। স্বপনের স্বরে সারাদিনের ক্লান্তি। গৌতম চুপচাপ শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে ১লা মের মিটিংএর কথা ভাবতে থাকে। তরাইয়ের কৃষকদের নেতা, নকশাল বাড়ির নেতা রেডবুক হাতে উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চে। অগণিত মানুষের বাঁধভাঙ্গা প্রাণোচ্ছ্বাস। যেন ১৯৪৯ এর তিয়েনমিন স্কোয়ার। উদীয়মান সূর্যের মত চেয়ারম্যান মাও মঞ্চের ওপর উঠে এলেন। সামনে বিরাট জনসমুদ্র—মুক্তির আনন্দে উচ্ছল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন চেয়ারম্যান—হয়ত দুঃখে, হয়ত আনন্দে। শত সহস্র শহীদের আত্মত্যাগের স্মৃতিতে, আর কোটি কোটি মানুষের শৃঙ্খল মুক্তির আনন্দে। গৌতমও যেন সে অনুভূতির শরিক হতে পারছে।

৩

রাত্রি প্রায় এগারোটা। স্টেট বাস গুমটির পেছনে বৃদ্ধ তেঁতুল গাছটার নীচে তিনটে ছেলে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে রঙের টিন, ব্রাশ, আঠার হাঁড়ি আর পোস্টার। পাশে ঘোড়া গাড়ি স্ট্যাণ্ডে গাড়িগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মেথরদের বস্তীতে তুমুল ঝগড়া চলছে। কে জানে কেউ হয়ত মদ খেয়ে বৌকে পিটোচ্ছে। গোবিন্দ আর সমরের বিরক্তি লাগছে। সত্যি, সন্ধ্যে থেকে ওরা অনেক খেটেছে। রঙ আর তেল কিনে রঙ তৈরি করেছে, পোস্টার লিখেছে। নরেশ চুপচাপ বসে আছে। প্রায় রোজই রাতে বেরোনোর জন্য মা রাগারাগি করছে। ইদ্রিস, সুবল আর প্রশান্তর সাড়ে দশটায় আসার কথা। এখনো পাত্তা নেই। গোবিন্দ ওদের না আসার কারণগুলো ভাবতে চেষ্টা করে। সুবলের না হয় ঝামেলা আছে। বাপ শালা রেশনের দোকানের মালিক—হিসেব মেলাবে—তাও আবার দুটো খাতা, একটা সাদা একটা কালো। চাল চিনি কম ব্ল্যাক করে! পৃথিবী শুদ্ধ সবাই জানে, শুধু সরকারী লোকেরা ছাড়া।

তারপর বাড়ি ফিরে হম্বিতম্বি—ছেলেমেয়েরা ঠিকমত পড়ছে কিনা। ব্যাটা আকাট—ম্যাট্রিক ফেল। ওর উপদেশ শুনলে গা পিত্তি জলে যায়। সুবলও বলে। ছেলেটা ভাল। সমর গোবিন্দর দিকে হাত বাড়ায়—এই বিন্দা। সিগ্রেট ছাড়্ ত।

গোবিন্দ চারমিনারের প্যাকেট বার করে। নরেশ নিঃশব্দে একটা হস্তগত করে। সমরকে একটা এগিয়ে দিয়ে গোবিন্দ বলে—আমাকে দিস্ শেষটা।

সমর সিগ্রেট ধরিয়ে বসে পড়ে। দেখাদেখি ওরাও বসে পড়ে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে।

—ইদ্রিসটা আসছে না কেন রে?

—কার খবর দেবার কথা ছিল?

—প্রশান্তর। ইদ্রিসের বাড়িতে বলে দেবার কথা।

—এটাই বোকামি হয়েছে। বাড়িতে অন্দুরে কী আর খবর পৌঁচেছে? দোকানে বলে এলেই হত।

—মালিকটা বদলোক। ভদ্দরলোকের ছেলেরা কর্মচারীর সঙ্গে গুজগুজ করছে দেখলে সন্দেহ করবে।

—আহা একটু কায়দা করলেই হল। সাইকেলে চাকার হাওয়া কমিয়ে পাম্প করাতে গিয়ে বলে এলেই হত।

গোবিন্দ ভক্তি ভক্তি চোখে নরেশের দিকে তাকায়। নরেশের মাথায় বুদ্ধি খেলে বটে। সমর প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা গোবিন্দর দিকে এগিয়ে দেয়—সুখটানটা দিস। বাস গুমটির আলোগুলোরও যেন ঘুম পেয়েছে, সন্ধ্যের সেই তেজ যেন নেই। সমর চুপচাপ ওদিকে তাকিয়ে থাকে। একটা বাসের সামনের কভার, ইঞ্জিন সব খুলে নিয়েছে। যন্তরটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। কানের কাছে একটা মশা বসছে বার বার। ঘোড়ার গু-এর একটা উৎকট গন্ধ।

—দুঃ শালা, আমাদের বাপের শ্রাদ্ধ আটকেছে, না! সব মেজাজে ঘুম মারবে, আর আমাদের—আমাদের কী দায় ঠেকেছে রে?

—আঃ! কী আজে বাজে বকছিস, চল, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। নরেশ আঠার হাঁড়িটা তুলে নিয়ে গোবিন্দকে বলে—ওঠ। ওয়ালিং থাক আজ, চটপট পোস্টারগুলো মেরে দিস।

সমর গজগজ করতে থাকে—না মানে একটা দায়িত্বজ্ঞান তো থাকা উচিত।

গোবিন্দ আঠা লাগিয়ে দেয় আর ওরা বাস স্ট্যাণ্ডের আশপাশের দেওয়ালে পোস্টার মারতে থাকে।

—এই বিন্দা, একটু এদিক ওদিক নজর রাখিস। থানাটাতো কাছে, মামারা না হাজির হয়।

—হুঁ দেখ, এলে এই বাঁ হাতের গলিটা দিয়ে।

বিরাট দেওয়ালটার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সেজে উঠেছে। বেশ লাগছে। পোস্টারগুলো লেখাও হয়েছে সুন্দর। প্রশান্ত আর নরেশ ভাল লেখে। আর মাত্র তিন চারটে বাকী। সমর গুনগুন করে কী একটা হিন্দী গান গাইছে। নরেশ গোবিন্দকে বলে—তোরা দুটোয় তো একই দিকে যাবি। মা বসে থাকবে দরজা খোলার জন্য। আমি যাব রে?

—রং তুলি নিয়ে যা তুই।

—কাল সকালে কাফে ডি প্রলেতারিয়েতে।

—হ্যাঁ ন টার মধ্যে।

-সমর আসছিস তো?

নরেশ চলে যায়। গোবিন্দ শেষ কটা পোস্টারে আঠা লাগিয়ে রাস্তার পাশের টিউবওয়েলে হাত ধুয়ে নেয়। নিঝুম নির্জন সিমেট্রি রোড দিয়ে ওরা বাড়ির দিকে ফেরে। বাঁ দিকে জেলা স্কুল, ডান হাতে বৃটিশ সাহেবদের কবরখানা।

—সমর তুই ইণ্টারন্যাশনালটা জানিস তো। গা না আস্তে। কথাগুলো জানি, কিন্তু সুরটা ঠিক কারুর সঙ্গে না গাইলে·

—নে, ধর।

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস ·····

কবরখানাটার দিকে তাকালে ছোটবেলায় ভয় করত গোবিন্দর, এখন মনে হচ্ছে বিশ্বের সব সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য কবর খুঁড়ছে ওরা। অত্যাচারীরা আজ আর মমি হয়েও বেঁচে থাকতে পারবে না। তাদের স্মৃতিতে কোন পিরামিড, কোন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর তৈরি হবে না। ওরা আজ বেপরোয়া, তাই তো ওরা আজ হিসেবী। ওদের চীৎকার করে গাইতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ওরা গলা চেপে গাইছে। ওদের দৃপ্ত পদশব্দে বিগত অত্যাচারীরা কবরের ভেতরেও শিউরে উঠছে। তাতেই হয়ত কবরখানার ওই দেবদারু গাছগুলো অমন শিরশির করে কাঁপছে। ওরা এগিয়ে চলেছে—

শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড
এস মোরা মিলি একসাথ।
গাও ইণ্টারন্যাশনাল
মি—লা—বে মানবজাত।

৪

মালদা জেলা বললেই আমের কথা মনে পড়ে গৌড—শশাঙ্কের রাজধানী। বাংলার রাজধানী। বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র রামকেলী। রূপ-সনাতনের মালদা। পীর-মকদুমের মালদা। হিন্দু-মুসলমান রাজত্বের দীর্ঘদিনের বাংলার রাজধানী। ইতিহাসের বইগুলোতে আছে এখানকার মাটিতে রাজায় রাজায় যুদ্ধের কথা। আর জেলার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে আছে রাজায়-প্রজায় যুদ্ধের ইতিহাস। তেভাগা, নীলবিদ্রোহ আর সাঁওতাল-বিদ্রোহের মালদা। এখনো জেলা সদরের নাম ইংরেজ বাজার। ইংরেজদের দুর্গটায় এখন জেলার ন্যায় বিচারের আদালত। শহর পার হয়ে একটু এধারে ওধারে এখনও স্কুলের ছেলেরা সরস্বতী পুজোর পলাশ ফুল তুলতে গিয়ে আম-কাঁঠাল-বাবলা-বনকুলের ঝোপে পরিত্যক্ত ভাঙা নীলকুঠীগুলো খুঁজে পায়। জেলার উত্তর-পূর্বে তিনটে থানা গাজোল, হবিপুর আর বামনগোলা—সাঁওতাল-অধ্যুষিত। অনুর্বর লালচে মাটিকে সাঁওতালেরাই চাষযোগ্য করে তুলেছে। তারপর নুন, কাপড় আর লণ্ঠনের বিনিময়ে জমি লিখে দিয়েছে। ধীরে ধীরে নিজেদের মেহনতে তৈরি জমিতে নিজেরাই ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে। অনেক দিনের চাপা ক্ষোভ জন্ম দিয়েছে জিতুর—জিতু সাঁওতাল। বৃটিশ পক্ষপুটে আশ্রিত জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করেছে কালো কালো সরল মানুষগুলো। তিনটে থানার সংলগ্ন বিশাল এলাকা থেকে পালিয়েছে দুষমনেরা। জিতুর নেতৃত্বে তারা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। অনেক যুদ্ধের নেতা জিতু তাই রূপকথার নায়ক। জিতু মরতে পারে না—জিতু ভগবান আছে—এই স্থির বিশ্বাস মানুষগুলোর মনে। ডাঙ্গি অঞ্চল—জলের বড় অভাব—বিদ্রোহীরা পুকুর তৈরি করেছে। কেউ না খেয়ে থাকে নি—নিজেদের ধর্মগোলায় যে সব ধান উঠেছে। বিদ্রোহী কিষাণেরা-জিতুর নেতৃত্বে আদিনা আক্রমণ করেছে। জিতু আছে, ভয় কী?

জান কবুল করে জয় হাসিল করতে হবে। হয়ত জিতুরও বিশ্বাস জন্মেছিল, ও মরতে পারে না। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণায় এগিয়ে চলেছে বিদ্রোহীরা। দুষমনদের সমস্ত বাধা ভেঙে যাচ্ছে। রাজদরবারে ঢুকে পড়েছে। জিতুকে লক্ষ্য করে অনেকগুলো বন্দুক গর্জে ওঠে। হঠাৎ বিদ্রোহী কিষাণেরা হতচকিত হয়ে পড়ে—জিতু, জিতু ভগবানের বুক থেকে রক্ত ঝরছে। জিতু তার সমস্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে মৃত্যুর আগে শেষ কথা বলে যায় —ওরে হিম্মৎ হারাস না। এক জিতু মরে যাচ্ছে, লক্ষ জিতু তৈরি হবে। আজও এ-ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে আদিনা ফোর্টের দেওয়ালগুলির দাগগুলো।

সেই লক্ষ জিতু তৈরির কাজে যুক্ত হতেই গৌতম চলেছে। কলকাতা ছেড়ে মনটা খারাপ লাগছে। বন্ধুরা অনেকেই স্টেশনে এসেছিল। বেশ উত্তেজনাও বোধ করেছে। ভোরবেলা স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে মালদার মাটিতে পা দিয়ে আপন আপন লাগছে—যেন কতদিনের চেনা। খেজুরিয়া ঘাট থেকে ট্রেনে বসে স্বপনের কাছে শোনা মালদা সম্বন্ধে নানান কথা ভাবছিল। এই প্রথম মালদা যাচ্ছে গৌতম। ৬৪ সালের পুজোতে বাড়িশুদ্ধ সকলে দার্জিলিং গিয়েছিল এই মালদার ওপর দিয়ে।

মালদা এসে গেল, মনে হচ্ছে। গেটের কছে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেগুলো —কলেজে পড়ে, বোধ হয়। কে জানে হয়ত গৌতমদের রাজনীতি করে। স্টেশনে গাড়ি ঢোকে। গৌতম কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে উঠে পড়ে। গেটে টিকিট দিয়ে ওয়েটিং রুমের চায়ের স্টলে এক কাপ চা নিয়ে দাঁড়ায়। আরেকবার স্বপনের দেওয়া ঠিকানা লেখা কাগজটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়। যদি কেউ না আসে স্টেশনে আর ঠিকানাটাও হারিয়ে যায়, তাহলে মুশকিল। একদম অপরিচিত জায়গা—একটা লোককেও গৌতম চেনে না। কলকাতা ফিরে যাবার টাকাও নেই কাছে। মা কিছু টাকা দিতে দেয়েছিল। গৌতমই নিতে চায় নি।—এরপর থেকে আমার সব দায়িত্ব পার্টির, মা।

—না, তবু বিপদে আপদে হঠাৎ দরকার হলে।

—না, মা। পার্টির নির্দেশ-নিরাপত্তার জন্য টাকা-পয়সার ওপর নির্ভর না করে জনগণের ওপর নির্ভর করতে হয়।

—অত বুঝি না, বাবা। এই দশটা টাকা অন্ততঃ রাখ।

জোর করে গুঁজে দিয়েছিল মা। ট্রেন তো ঠিক সময়েই এসেছে? না,

ঘড়ি দেখে গৌতম, বরং দশ মিনিট লেটই করেছে। তাহলে এখনও কেউ আসছে না কেন? গৌতম পকেটে হাত দিয়ে পয়সা বার করে চায়ের দাম দেয়। পকেটে মোট ক'টা টাকা আছে তাও গুণে নেয়।

দূরে এক পাশে দাঁড়িয়ে একটি বছর ষোল সতেরো বয়েসের ছেলে গৌতমকে লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল, এই ঠিক লোক। এদিক ওদিক দেখে গিয়ে গৌতমকে জিজ্ঞেস করে—আপনি কোথায় যাবেন?

গৌতম ভাবছিল কেউ না এলে, স্বপনের দেওয়া ঠিকানায় কীভাবে যেতে হবে। আর তাও না খুঁজে পেলে কা করবে? কলকাতা ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। হঠাৎ প্রশ্নে সচকিত হয়ে ওঠে।

—আমি, এই এখানেই, সিঙ্গাতলায়।

—আমিও ওদিকেই যাবো। একজনের জন্য অপেক্ষা করছি।

—ও। গৌতম ঠিক বুঝতে পারে না, এই সেই লোক কিনা।

—আমাকে জহরদা পাঠিয়েছে। আপনার নামটা?

গৌতম সচেতন ভাবে বলে—অশোক। দু'পক্ষই বুঝতে পারে কোড মিলেছে। ঠিক লোক। গৌতম ব্যাগটা তুলে নেন।—চল, ভাই।

—চলুন। ওপাশটায়। সাইকেলটা ওদিকে রেখেছি।

গৌতম সামনে বসে। বাজু চালক। স্বপনের সঙ্গে কখন দেখা হবে, জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে কিনা ভাবে গৌতম।—আচ্ছা ভাই তোমার নামটা?

—আমার নাম বাজু। মানে ডাক নাম।

—জহরের সঙ্গে কখন দেখা হতে পাবে?

—সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ। দুপুরে টাউন সংগঠনের মিটিং আছে। সেরেই আপনার ওখানে যাবেন।

দু'জনেই চুপচাপ। বেশ জোরেই চালাচ্ছে সাইকেল। শহরটা কীরকম নিস্তেজ মনে হয় গৌতমের।

—তুমি স্কুলে না কলেজে?

—এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দেবো। আমাদের শহর কেমন লাগছে? হ্যাণ্ডেলটা অত কড়া করে ধরবেন না।

—ও না, হ্যাঁ শহরটা, ভালই তো।

ট্রাম-বাসের আওয়াজ নেই। গাড়ির হর্নের শব্দ নেই। শুধু মাঝে মাঝে রিক্সার প্যাক প্যাক। দাঁত বের করা একটা ইঁটের রাস্তায় সাইকেল থামে।

সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে রাজু আলকাতরায় রং-করা পাশের একটা দরজার শেকল নাড়ে।

—চঞ্চল, চঞ্চল। অশোকদা, আপনি আজ এখানেই থাকবেন।

বেঁটেখাটো চেহারার চঞ্চল বেরিয়ে আসে।—আসুন আসুন, রাজু কি এক্ষুণি চলে যাবি?

—হ্যাঁরে, একটু কাজ আছে। অশোকদা, চঞ্চলের সঙ্গে শহরটা ঘুরে দেখে নেবেন। জহরদা বাস স্ট্যাণ্ডগুলো ভাল করে চিনে নিতে বলেছে। আপনার যা দরকার চঞ্চলকে বলবেন। আমি আর দেরী করবো না। লাল সেলাম, কমরেড।

বেশ ছেলেটা। গৌতম রাজুর ফেলে-যাওয়া পথটার দিকে চেয়ে থাকে।

—আসুন। চঞ্চল গৌতমের হাত থেকে ব্যাগটা নেয়। গৌতম চঞ্চলের পেছনে বাড়িতে ঢোকে।

৫

মিনু আয়নাটা বালিশে হেলান দিয়ে চিরুনি নিয়ে চৌকিতে বসে। দু'হাতে চুলগুলো বাগে আনতে সচেষ্ট। বিকেল চারটে সাড়ে চারটে। চুলের জট ছাড়িয়ে দু'টো ক্লিপ তুলে নেয়। চুলে আটকাতে গিয়েও কী ভেবে দাঁতের মাঝে চেপে ধরে বিনুনিটা আবার ঠিক করতে থাকে। আয়নার নীচের দিকের একটা কোণ ভাঙ্গা। পুরো মুখটা দেখা যায় না। আজ মিনুর খুব সাজতে ইচ্ছে করছে। পরীক্ষা শেষ হয়েছে বেশ ক'দিন হল। সেই ইংরেজী নিয়েই একটু ভয় আছে। তবে ওর কেন যেন মনে হচ্ছে, পাশ করে যাবে। পরীক্ষার পর একটাও সিনেমা দেখা হয় নি। দীপুর প্রেসে কাজের খুব চাপ পড়েছে। একদম ছুটি করে উঠতে পারছে না। আজ সেকেণ্ড শো'তে যাচ্ছে। দীপু বলছিল 'আরজু' নাকি দারুণ ছবি। ও টিকিট কেটে হলেই দাঁড়াবে। বাড়িতে সবই জানে। কিন্তু বন্ধুরা কেউ যদি দেখে ফেলে? কী ভাববে? সিনেমা হলের সামনে একটুও দাঁড়াবে না। ও পাড়াতে ওদের ক্লাশের অনেকে থাকে। কারুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়? দাদা বলে পার পাবার উপায় নেই। উঃ, ওরা যা, সত্যি সত্যিই দাদার সঙ্গে গেলেই বলে, কীরে কাল তোর [illegible]

খু-উ-ব ? যদি জিজ্ঞেস করে যে কী করে রে ছেলেটা ? নাঃ, মিনুর মনে হয় দীপু বড় সাদামাটা। বলার মত কিছুই নেই ওর।

—দিদি, দিদি, দেখ কে এসেছে।

সন্তু ছুটে আসে। মিনুর চুল বাঁধা হয়ে গেছে।

—কে রে ? বারান্দায় বেরিয়ে আসে মিনু। ওমা জহরদা। যাক, এদ্দিন পরে তবু মনে পড়েছে আমাদের।

—কেমন আছিস, বল্। পরীক্ষা কেমন হয়েছে ?

—আমি খেলতে যাচ্ছি, জহরদা। ছুটে বেরিয়ে যায় সন্তু।

জহর ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করে—কীরে, বললি না, পরীক্ষা কেমন হয়েছে ?

—এই হয়েছে আর কি।

—পাশ হবে ?

—কোন রকমে হয়ে যেতে পারে। চা খাবে, জহরদা ?

- না রে। মেসোমশাই ফেরেন নি ?

—না।

—মাসীমার শরীব কেমন রে ?

—ভাল যাচ্ছে না। আপনি এত রোগা হয়ে গেছেন কেন ?

—সত্যি। শরীব সারাতে এখানে চেঞ্জে এলাম। তা জলটা বোধ হয় ঠিক

—যাঃ, আমি কী তাই বলেছি ? একটু লজ্জায় পড়ে যায় মিনু। ওর খেয়াল হয়, জহরদা তো চারপাশে দেখা আর পাঁচটা লোকের মত নয়।

—সোনাকাকুব খবর জানেন ?

—কলকাতায় নেই। নিশ্চয়ই ভাল আছে।

—এদিকে আসবে না ?

—ওর জায়গার কাজটা কে করবে তাহলে ?

—না, মানে এমনি আর কী যদি আসে। তোমাদের এদিকের কাজ কেমন হচ্ছে ?

—না জাগিলে বঙ্গ ললনা জাগিবে না এই বঙ্গদেশ। বুঝলি ?

—সে কথা বলতে পারবে না। রাজু 'মা' আর তিনটি লেখা দিয়েছিল। পড়ে ফেলেছি।

—গুড। তা এবার একটু কাজকর্মও শুরু কর।

—বা রে, করবো না বলছি ? এখন তো স্কুলও নেই, পরীক্ষার পড়াও শেষ। বলো না কী করতে হবে ?

—রাজু তো তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেই। ওর সঙ্গে আলোচনা করবি। দুনিয়াটা সম্বন্ধে ধারণাটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার করতে হবে তো। মেয়েদের রাজনৈতিক কাজ করায় অনেক অসুবিধে। কিন্তু বাধার বেড়া তো ডিঙোতে চেষ্টা করতে হবে। ধীরে ধীরে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার শুরু কর।

—আমি পারবো ?

—পারবি না মানে ? বসে বসে পারবো কিনা ভাবলে তো কোনদিনই পারবো না। জলে না নামলে কী জল সম্বন্ধে ভয় কাটবে রে ?

—জহরদা, তোমরা এত সাহস, ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার এই সাহস কোথা থেকে পাও।

জহর যেন নিজের ভেতরে উত্তর পেতে চেষ্টা করে। মিনুর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে উত্তর দেয়—মানুষকে ভালবাসা থেকে রে, বিশ্ব-ইতিহাসের গতি থেকে, মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা থেকে।

মিনু একটা অদ্ভুত ব্যথা, একটা কোন সুদূরের আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। অভাব, অভাবের যন্ত্রণা, সামাজিক লাঞ্ছনা তো কম সইছে না। খাওয়া আর ঘুমোনোর জন্য তো জন্তু-জানোয়ারেরাও বাঁচে। সে বাঁচা নয়। আমরা মানুষ, আমরা পৃথিবী জয় করেছি ; আমরা আমাদের চেষ্টায় সভ্যতা সৃষ্টি করেছি। সেই কতদিন আগে সোনাকাকুর কাছে শোনা কথাগুলো মিনুর কানে বাজতে থাকে।

—মিনু। নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জহর ডাকে।

—শোন তোকে বলছিলাম না আমাদের গ্রামের একজন কমরেড দু-এক দিনের জন্য শহরে এসে তোদের বাড়িতে থাকবে। মেসোমশাইকেও বলেছিলাম। তবে আমাকে তো মেসোমশাই থাকতে দিয়েছিলেন সোনার বন্ধু বলে। এ-ছেলেটি কিন্তু সেইভাবে সোনার ব্যক্তিগত বন্ধু নয়। তোর কী মনে হয় আপত্তি করবেন ?

—মনে হয় না আপত্তি করবে। বাবার আসলে কী যেন হয়েছে, কোন কিছুতেই আর বেশী গা করে না। কেমন একটা গা-ছাড়া ভাব। কবে আসবেন ?

—বাবু ওকে আগামী মাসের শেষ শনিবার নিয়ে আসবে।

—ঠিক আছে। নতুন এসেছেন?

—হ্যাঁ। পরেশের ট্রাকের চাকরীটা আছে তো?

—হ্যাঁ। এই দিন তিনেক আগে এসেছিল। আবার কাল চলে গেল। গৌহাটি যাবে এবার। বেশ রোগা হয়ে গেছে। খুব খাটতে হয়তো।

—তুই ওকে একটু পলিটিক্স দেবার চেষ্টা কর। আমি উঠি রে আজ।

—আবার ক'মাস বাদে আসবে?

—সময় পেলে আসবো। চল ও ঘরে একটু মাসীমার সঙ্গে দেখা করে যাই।

হঠাৎ মিনুর খেয়াল হয় অনেক্ষণ ধরে গল্প করছে। রোদ পড়ে এসেছে। সিনেমার সময় পেরিয়ে গেল নাতো!

—মা ঘুমোচ্ছে এখন।

জহর বেরিয়ে যেতেই মিনু সন্তুর খোঁজে রাস্তায় যায়। একটা রবারের বল নিয়ে গোটা আষ্টেক ছেলে গলিটা তোলপাড় করছে।

—সন্তু, এই শোন্ না, এই সন্তু।

—আঃ, থাম না।

—এক মিনিট শোন্। মা একা থাকবে। খোকন কোথাও দূরে না যায়। খেলা শেষ হলেই বাড়িতে থাকবি। তুই আর খোকন খিদে পেলে খেয়ে নিস। আমি বেরোচ্ছি।

সন্তু ঘাড় নেড়েই আবার খেলায় মাতে। কালীতলার গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে মিনু। না, দেরী হয় নি। ফার্স্ট শো ভাঙ্গল।

ঐ তো সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীপু। বাব্বাঃ, ধবধবে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরেছে। মিনু সিনেমা হলের গেটের সামনে চলে যায়। দীপু ওর পেছনে আসে। ভেতরে ঢুকে পড়ে দু'জনে। পর্দায় তখন একটা কৃষক ট্রাক্টর চালাচ্ছে। লোকটা বাড়ি ফিরে যায়। অ্যাসবেসটসের সুন্দর বাড়ি। দুটো বাচ্চা আর লোকটার বৌ-ই বোধ হয় হাসিহাসি মুখে এগিয়ে আসে। মিনুদের বাড়িটাও এত সুন্দর নয়। শহরের আশে-পাশেই গ্রামের চাষাগুলোকে দেখে মিনু রোগা প্যাটকা। এই ছবিগুলোতে এত গ্যাস দেয়। 'ছোট পড়ে 'র সুখী পরিবার' শেষ হয়। ভীষণ বিরক্তি লাগে মিনুর। দীপুরও লাগছে না। চড়া সুরের বাজনা বেজে ওঠে। এবার 'বই' শুরু হচ্ছে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলে দীপু—'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

৬

অশোক দাওয়ায় তালপাতার একটা চাটাইয়ের ওপর চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে। জয়রামপুরে পুনর্ভবার ডোবা অঞ্চলের একটা গ্রাম। ডোবা অঞ্চলের ইতিহাস বড় অদ্ভুত। প্রকৃতির সঙ্গে জুয়া খেলে এ-অঞ্চলের মানুষ বেঁচে আছে। ডোবা অঞ্চল প্রায় প্রতি বছরই মাস পাঁচেক জলে ডুবে থাকে। দেশভাগের আগে এ-চত্বরে পুনর্ভবার মূল ধারা ও খাড়িগুলোর ধারে ধারে প্রায় মানুষজন বাস করত না বললেই চলে। কয়েক পুরুষ আগে ডুমকার পাহাড় থেকে সাঁওতালেরা এসে ডাঙ্গা এলাকায় জঙ্গল সাফ করে জমি তৈরি করেছে। পাথুরে লালমাটির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতেই যারা অভ্যস্ত জলা অঞ্চলের জীবন ঠিক তাদের টানে না। তাই ডাঙ্গার লালচে মাটিতেই ঘর বেঁধেছে তারা। বড় বড় ঘাস আর আকন্দ, বাবলা, বনফুলের ঝোপে পরিত্যক্ত থেকেছে ডোবার মাটি। শুখার দিনে সাঁওতালেরা মাঝে মাঝে এসে ঘাস কেটে নিয়ে যেত, মাছ ধরত, জলা থেকে শাপলা তুলে নিয়ে যেত। বছরের পর বছর পুনভবা বুকে পলি বয়ে এনে উজাড় করে দিয়ে গেছে। সব রস শুষে আগাছা বেড়েছে। কেনপুকুর বুলবুলির বাবুদের নজর পড়ল। কিছু কিছু জায়গাজমি ইজারা নিল। সাঁওতাল দিন-মজুরের দল রোজে খাটতে লাগল, জঙ্গল সাফ করে জমিতৈরির কাজে। ওদিকে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। দেশ ভাগ হল। অদৃশ্য হাতের খেলায় গরীবে গরীবে লড়াই শুরু হল। হিন্দু গরীব আর মুসলমান গরীবে। অক্ষত মালিকশ্রেণী নিজেদেরটা ঠিক গুছিয়ে নিল—তাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগল না। দলে দলে এপারের মুসলমানেরা ওপারে, আর ওপারের হিন্দুরা এপারে আসতে শুরু করল। মহানুভব ভারত-সরকার জন-মানবহীন অঞ্চলে জঙ্গল সাফ করার কাজে নিযুক্ত করলেন এই সস্তা শ্রম-শক্তিকে। উপরি-লাভ এই রিফুউজিদের সীমান্ত এলাকায় রাখলে পাকিস্থান ও মুসলিমবিদ্বেষী একটা বেষ্টনী তৈরী থাকল। তবু দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের চেয়ে এই ডোবা অঞ্চলের উদ্বাস্তুরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। জলের মাছ জলেই আছে, শুকনো ডাঙ্গায় পড়ে হাঁস-ফাঁস করতে হচ্ছে না।

—ও মাস্টর, ঘুমাইয়া পড়লা নাকি? খাইতে আস।

অশোক খেয়ে ওঠে। ভাল করে ঘটি থেকে জল নিয়ে কুলকুচি করে।

তবুও জিভ-ঠোঁট সব জ্বালা করছে। কলাইয়ের ডাল আর ভাত। গরম-কাল তো—শাকপাতা তেমন পাওয়া যায় না। কলাইয়ের ডালকে একটু গরম কড়াইয়ে সেঁকে নিয়ে প্রচুর শুকনো লঙ্কা-সহযোগে রাঁধে। মুখটা প্রচণ্ড জ্বালা করছে। অশোকের মাঝে মাঝে ভয় হয়—রক্তামাশা না হয়। বৌদির কাছে আরো এক ঘটি জল চেয়ে খায়। পঙ্কুদা একটা বিড়ি এগিয়ে দেয়। বৌদি উনুন থেকে একটা নিবু নিবু কাঠের টুকরো ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে। দু'জনেই বিড়ি ধরিয়ে নেয়।

পঙ্কুদা দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করে—তা মাস্টর কাল বাঙাল-পাড়া যাইবা নাকি ?

—কেন ? কালার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল নাকি ?

—হ। কালা আইছিল। কইছে, মাস্টর রে কাল সাঁঝেব বেলা পাঠায়ে দিবা। রাতে হুথায় থাকনের লগে কইছে। তিনচারজনা কমরেড বানায়েছে কালা—মিটিং করব।

—কালা বেশ কাজের ছেলে, বল। হরেনদা কিন্তু ঘরের কাছেই খালি ব্যস্ত থাকছে। তোমরা এমন ঢিলে দিলে পার্টি দাঁড়াবে কী করে ?

—হঃ, কী কও। ল্যাজ্য কথাটি মানষে শোনব না,ই হইতে পারে। দুই চারডা দিন ট্যাম দাও। সব হালায় বোঝবো না।

অশোক বিড়িটায় শেষ টান দেয়। বিড়ির সুতোটা ধরে যায়। কেমন একটু পোড়া পোড়া গন্ধ। দুজনেই চুপ করে থাকে। বৌদি খেয়ে উঠেছে।

—মাস্টর, ঘুম পায় কী ?

—নাঃ।

—রাইত হইছে। শুইয়া পড়।

পঙ্কুদা হাঁটু দুটোর ওপর দু'হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শীর্ণ পাকানো চেহারা। বয়স কত—তা প্রায় পঁয়তাল্লিশ হবে। কখনও কখনও অশোকের মনে হয়, পঙ্কুদা জীবনযুদ্ধে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু অদ্ভুত স্পিরিটেড। অশোক যখন চীন-ভিয়েৎনামের কৃষকদের লড়াইয়ের গল্প বলে, তখন ও দেখেছে পঙ্কুদার চোখের মণিতে একটা আলো চিকচিক করে জ্বলে ওঠে। কী প্রবল বিশ্বাসের সুর বেজে ওঠে তখন পঙ্কুদার গলায়—হইব হইব এ পোড়া দ্যাশেও হইব। মাইনষে অনেক ঠইকছে কিনা, ওই লগেই একটুকুন দেরী হয়। কংগ্রেস ঠকাইল—দ্যাশেরে ভাগ কইর‍্যা ছাড়ল। ভোট ভোট কইর‍্যা কতদিন ঠকাইল।

আর, আর যাবি কুথা হালারা? মুখ্যের পাল আমরা, বুইছো। হালার ই কথাডা বুঝে নাই, না লইড়লে বাঁচন যায় না। ই ধর গিয়া মিত্তিকা মা আমাদের। ইনার সঙ্গেই কী কম যুদ্ধ কইরলে খাইতে পাই। বাবু বেটারা, কাত্তিক মহাজন রক্ত শুষতিছে—ওদেব কাম ওরা কত্তিছে। আমাগো ক্সাম আমাদের করন লাগাবো না?

অশোক চাটাইয়ের ওপর গিয়ে বসে। ওর ব্যাগ তথা বালিশটাকে ঠিক করে নেয়। ব্যাগে তিনচারটে বই, একটা খাতা-কলম, একটা পাজামা, আর দুটো শার্ট। পাজামা আর শার্টটাকে বইয়েব ওপব ভাঁজ করে গুছিয়ে নেয়। মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে। বৌদি মাথার কাছ দিয়ে যায়। চোখ বন্ধ করেও অশোক বুঝতে পারে বৌদি, ঘবে ঢুকবে। নারান নারান করে দুবার ধাক্কাবে। তারপর 'জ্বালাতন, মরণও হয় না মড়াগুলোর' বলে এক বকম হ্যাঁচডাতে হ্যাঁচড়াতে নারানকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেড়ার কাছে দাঁড় করিয়ে দেবে। বৌদি কিন্তু নারানকে খুব ভালবাসে। তবু এই সময় রোজ বাতে গাল দেয় কেন? কাকে গাল দেয় আসলে? পঞ্চুদাকে, না নিজের ভাগ্যকে? সারাদিন মুখ বুজে খেটে যায়। রাজনীতির কথা বলতে চেষ্টা করেছে অশোক। কিন্তু কোন ফল হয় নি। ভীষণ নির্লিপ্ত। শুনে যায়, কিন্তু কিচ্ছু বলে না। খুব স্নেহ-প্রবণ। পঞ্চুদা হারান, নাবান, অশোক—হ্যাঁ অশোককেও কীরকম মায়ের মত স্নেহ করেন।

নারান ঘুমোতে ঘুমোতেই পেচ্ছাব করে। বৌদি ঝাঁঝিয়ে ওঠে—নে চ, দাঁডায়ে থাকলি ক্যান? নারান দাওয়ার সিঁড়িটায় উঠতে গিয়ে একটা হোঁচট খাবে এবার।

—কী কাল নিদ্রায় পাইছে তরে! অঁঃ, মাটির দিক চোখ খুইল্যা তাকাইতে পারস না?

রোজ এই একই রুটিন। ভুল হলেই নাকি এই ছ'বছর বয়েসেও নারান বিছানা ভিজিয়ে দেয়। দাওয়ার ওদিকে ঘরের দরজার পাশে লণ্ঠনটা রেখে নিভিয়ে দেয়। দরজার ঝাঁপ বন্ধ করে। হারান গরমকালে বসনার বাড়ির দাওয়ায় শোয়। অনেক রাত অব্দি গল্পগুজব করে আর ফেরে না। সন্ধ্যে হলেই খেয়ে ওখানে চলে যায়। ওদের খুব ইচ্ছে একটা যাত্রা করে।

অশোকের ঘুম আসছে না। ডান হাঁটুর কাছে ব্যথা ব্যথা করছে। মাইল চারেক উত্তরে নতুন একটা গাঁয়ে কয়েকটা যোগাযোগ পেয়েছিল।

সকালে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা ফিরেছে। মাইল আটেক হেঁটেছে। কাল বাঙাল-পাড়া যেতে হবে। অশোক নিজের অজ্ঞতাব কথা ভেবে মনে মনে নিজেই হেসে ওঠে। এখানে এই রিফিউজীদেব বাঙাল বলে না। দু'জাতেব রিফিউজী আছে—নমোশূদ্র আর কপালী। সাঁওতালেবা এদের সবাইকেই 'নমো' বলে। আব মুসলমানেবা বলে 'রিপু'। রাজবংশী আব পালিয়াদেব এ-অঞ্চলে বলে বাঙাল। চেয়ারম্যানেব কথাটা মনে পড়ে অশোকেব— যে-মাটিব বুকেব ওপব যে-মানুষেরা বিপ্লব কববে, তাদেব ইতিহাস, জীবনধারা, সংস্কৃতিকে ভালভাবে না জানলে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা কবা যায না। অশোকেব খারাপ লাগছে না। মনে হচ্ছে, ও পাববে গ্রামে কাজ কবতে।

গরুব গাড়িব একটানা ক্যাঁচব ক্যাঁচব আওযাজ আসছে। উঠতে ইচ্ছে কবছে না অশোকের। চোখ কচলে তাকায। অনেকটা পিঁচুটি চোখেব কোণ থেকে উঠে আসে। হঠাৎ ধড়ফড় কবে উঠে বসে। চালেব ওপব থেকে গামছাটা টেনে নিযে কাঁধে ফেলে নেয। বাস্তা থেকে একটা আলে নেমে পড়ে। এদিকটায় একপ্রস্থ লাঙল দিয়েছে। মাটি ঢেলা ঢেলা হযে আছে। খাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। দাতন ভাঙতে ভুলে গেছে। প্রায়ই ভোলে। যাকগে, পায়খানা করবে। এমনি জল দিয়ে মুখ ধুযে নেবে। দাঁতন না কবা আর বিড়ি মিলে সন্ধ্যে থেকে মুখে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ হবে। উল্টো দিক থেকে স্বাস্থ্যবান একটা ছেলে আসছে। নামটা মনে করতে চেষ্টা কবে অশোক।

—কী মাস্টব, দেখি না ক্যান?

—কেন, আছি তো এখানেই।

—খাবিকপুব, বীরভূম জেলা গো, ওখান থেকে কাল ভগ্নিপোতের চিঠি আইছে। লিখছে তোমাদের নক্সাল পার্টি খুব জোবদাব হইতেছে। এদিক পানে তো তেমন কিছু দেখি না?

—সবাই যদি দেখতেই চায় তো কববেটা কে?

—হ। ই কথাডা ঠিক কইছ। তা আইস না একদিন ঘরেব পানে। বসনার তিনটা ঘর উত্তুরে। চিন তো?

—আচ্ছা, কাল যাবো।

এগোয় অশোক। এ-গ্রামটায় শ্রেণীশত্রু বলতে কেউ নেই। কাত্তিক মহাজন এ-তল্লাটের কুবের, থাকে দু গাঁ ছেড়ে। এখানে সবাই ক্ষেত-মজুর, আর

গরীব চাষী। কিছু মধ্য-চাষীও আছে। আচ্ছা পঙ্কুদারা কী গরীব চাষী না মধ্য-চাষী? এই জায়গাটাই ভাল—খাড়িটার ধার ঘেঁসে বসে পড়ে অশোক।

ওই দূরের সবুজ গাছগুলো, নদী পার হয়ে, ওটা পাকিস্থান। বেশ লাগে। এদিকে ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠ। নদীর চর আর চাষের জমি বরাবর। পশ্চিমে প্রায় মাইল দুয়েক দূর থেকে চড়াই। ডাঙ্গি শুরু হয়েছে। দূরে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা গ্রাম। চৈতালী ফসল উঠে গেছে। ভাদই আর আমনের এরা আশা না করেই বোনে। প্রায় ফি-বছরই পুনর্ভবার খিদে মেটাতে চলে যায়। কুলতলীটা কোন দিকে কে জানে! সেখানে বাঁধ দিলে নাকি অনেক জমি নদীর কোপ থেকে বেঁচে যাবে। এরাও এদেশের নাগরিক। কিন্তু রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল এদের জন্য নয়। সরকার শুধু বিরাট একটা কাজ করে দিয়েছে। সারা পুব দিকটায় সীমান্ত জুড়ে তিনচার মাইল পর পর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ক্যাম্প বসিয়েছে। দ্রাবিড়-উৎকল-পাঞ্জাব-মারাঠা নানা জাতের সেপাইরা দেশের সীমান্ত বাঁচাতে এসে দেশের নারীদের ইজ্জত বিপন্ন করে তুলেছে। যেখানে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে সেসব ক্যাম্পের সিপাইরা কেঁচো হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় বাধা না পাওয়ায় নোংরামি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। উঠে পড়ে অশোক। একটু উজানের দিকে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। গিয়ে আবার ক'টা বাচ্চাকে একটু পড়াতে হবে।

৭

এই জায়গাটাই তো। একবার ভাবে অশোক। রাজুর এখানেই আসার কথা। অশোককে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে পরের দিন জহর ওর নিজের এলাকায় চলে গিয়েছিল। তারপর মাঝে একদিন জহর খবর নিতে এসেছিল অশোকের এলাকায়—কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। তাও অশোকের সঙ্গে দেখা হয় নি। অশোক সেদিন জয়রামপুর থেকে অন্য এক গ্রামে গিয়েছিল। কবে যে দেখা হবে স্বপনটার সঙ্গে। হঠাৎ সচেতন হয় অশোক। স্বপন কে? স্বপন নয়—জহর। আরে আশ্চর্য, এই দেড় মাসেই ওর নিজের আসল নামটাও প্রায়

ভুলাতে বসেছে! এখন অশোক বলে কেউ ডাকলে কী সহজেই ও সাড়া দেয়? এই দেড় মাসেই কেমন পঞ্চুদা, হরেন, কালা এদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে চিন্তা-ভাবনাগুলো। কলকাতায় থাকতে শারীরিক কষ্টগুলোকে ফালতু বড় করে ভাবতো, মনে হয়। ও ইচ্ছে থাকলেই মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় একা একা লাগে। তখন খুব কলকাতার কথা মনে পড়ে। ওঃ, কতদিন কাগজ পড়ে নি। কী খবর দেশের কে জানে! কিন্তু রাজু আসছে না কেন! এদ্দিন শুধু বিড়ি খেয়েছে। একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে।

অশোক একটা চারমিনার ধরিয়ে শহরে কী কী কাজ সারতে হবে, ভাবে। কী যেন নাম বলেছিল স্বপন, ওঃ না জহব। —নরেশ? নরেশই। ওর কাছ থেকে জেলা-সংগঠন কমিটির সিদ্ধান্তগুলো জেনে নিতে, আর পরের মিটিং-এর দিন জেনে নিতে। লুঙ্গিটা বদলে নিতে হবে। পুরোনো হলে কী হবে, কলকাতার বাবুদের এ-জাতীয় লুঙ্গি এদিকে কেউ পড়ে না। আর ক'দিনের খবরের কাগজ দেখে নিতে হবে। কলকাতায় থাকতে গ্রামে কাজ, কৃষিবিপ্লব, এসব সম্বন্ধে সত্যি সব অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা ছিল। না, তাই বলে ধান গাছের তক্তা হয় ভাবতো না। কিন্তু এতদিনে সত্যিই অশোক অনেক নতুন গাছ চিনেছে। কৃষকদের জীবন দেখেছে—প্রচণ্ড একঘেঁয়ে। কলকাতায় বেশ বিপ্লব বিপ্লব উত্তেজনায় গা গরম হয়ে থাকে। কোন না কোন হৈ চৈ লেগেই আছে। আজ এই প্রোগ্রাম তো কাল আরেকটা। আর এখানে কিছুই ঘটে না। শুধু মাটি কামড়ে পড়ে থাকা।

ব্যস্তসমস্তভাবে রাজু হাজির। অনেকদিন বাদে একটা চেনামুখ দেখে খুশী লাগে অশোকের। ওরা দু'জনে চলতে শুরু করে।

—একটু ঘুরেফিরে সেন্টারে গেলে হতো না?

—চলুন। নদীর ধারে যাবেন?

—চলো।

রাজু আর অশোক মহানন্দার ধারে গিয়ে বসে। নদীটায় অনেকটা চর পড়েছে। তবুও পারাপার নৌকোতেই করতে হয়। খেয়া নৌকোটা ওপারে লোক নামিয়ে ফিরছে। নদী উত্তরে খানিকটা এগিয়েই বাঁক নিয়েছে।

—এই মহানন্দার উৎপত্তি কোথায় জানো, রাজু?

—না, মানে এই উত্তর দিক থেকে আসছে তো!

—দার্জিলিং-এর টাইগার হিল থেকে।

রাজুর নিজের ওপরেই রাগ হয়। জন্মের থেকে নদীটাকে দেখছে, অথচ কোত্থেকে উৎপত্তি, তা কোনদিন খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি।

অশোকের দার্জিলিং-এর কথা মনে পড়ে যায়। রাত থাকতে উঠে টাইগার হিলে পৌঁছেছিল। মনে হয় যেন একটা অন্য জগত। একটু ভোর ভোর আলোআঁধারী। চারপাশে অল্প অল্প মেঘে পাহাড়গুলো ঢেকে গেছে। এদিক-ওদিক দু-চারটে চুড়ো মেঘের ওপর ভাসছে। মেঘগুলোর রঙ হঠাৎ অদ্ভুত বদলাতে শুরু করলো। আকাশের কোন এক প্রান্ত একটু রক্তিম হয়ে উঠল। হঠাৎ একটা দুষ্টু ছেলের মত লাফাতে লাফাতে টকটকে লাল সূর্যটা উঠে এল। আর চারদিকে নানা রঙের এক অপূর্ব সমুদ্র। মনে হচ্ছিল যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে চারদিক ফর্সা হয়ে এল। একপাশে ছোট্ট একটা ঝিরঝির ঝরণা। গাইড বলল, ওটা মহানন্দা। ওই ছোট্ট মহানন্দা এখানে কী বিশাল! উদীয়মান সূর্যের লাল আলোয় ওর মহানন্দার সঙ্গে পরিচয়। স্বল্প জলের পুঁজি নিয়ে মহানন্দা ছুটে এসেছে। কোথাও থেমে থাকে নি। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে অশোক। রাজুর চুপচাপ এমনি বসে থাকতে অস্বস্তি লাগে। অশোক যেন নিজের ভেতর হারিয়ে গেছে। আজ পঞ্চাশ কোটির ভেতর ওরা ক'জনই বা। কিন্তু ওরা থামছে না। ওরা রোজ জোরদার হচ্ছে আর শত্রুরা রোজ ক্ষইছে।

—উঠবে, অশোকদা?

—উঁ, হুঁ, চল উঠি।

দু'জনে নদীর পাশের বাঁধ রোড ধরে এগোতে থাকে। বাঁয়ে ফাঁকা মাঠে অন্ধকার চেপে বসছে। ডান দিকে একটা বস্তী। পাশেই একটা ছোট ফ্লাওয়ার মিল।

—এদিককার বস্তীতে কারা থাকে রে?

—মেথর, ডোমরাই বেশী। ওদিকে ক'ঘর এই ময়দা কলের শ্রমিক থাকে।

—এদের মধ্যে আমাদের কোন সংগঠন আছে?

—শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারের কাজ কিছু হয়েছে। সমর্থক হয়েছে দু-একজন। কিন্তু সংগঠন এখনও গড়ে ওঠে নি। আর মেথরদের মধ্যে শুরুই করা যাচ্ছে না।

—তুই কোন্ দিকটায় কাজ করিস রে?

—ওই ঘাটের ওপারে। মাঝিদের দু-একটা বসতি আছে। ওদের মধ্যে।

—তোর অভিজ্ঞতা কী?

—ওদের উৎসাহ খুব, জান। আমি গেলেই সবাই এসে বসে। আমাদের কথা শোনে। সায় দেয়। ওদের কারুর অসুখ-বিসুখ হলে আমি হাসপাতালে এনে দেখাবার ব্যবস্থা করি। ওদের মধ্যে আমাদের বয়েসী ছেলেগুলোর তো দারুণ উৎসাহ।

—নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে।

—সংগঠন গড়ার কাজ এখনও নিজেরা করে নি। তবে রাজনীতি প্রচার করে।

অশোকরা একটা বড় পাকা রাস্তায় এসে পড়ে। অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর গদি, নোংরা জলের খাল আর নেতাজীর মূর্তি পাশে ফেলে কালীতলার গলীতে ঢোকে। সরু গলি, পাশাপাশি দু'জন হাঁটা যায় না।

অশোকদের বাড়ি থেকে ল্যান্সডাউন রোডে যাওয়ার শর্টকাট এমনি একটা রাস্তা আছে। অশোকের মা'র কথা মনে পড়ে—তোদের কথা মানুষে বুঝবে না? তোরা নিজের জন্যে তো কিছু করছিস না। দেশের জন্যই তো এত কষ্ট করছিস।

—সুজিতদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?

—না রে, তুই, চঞ্চল আর নরেশ ছাড়া আর কাউকেই তো আমি চিনি না।

একটু যেন অভিমান বেরিয়ে আসে ওর কথায়। ওকে যেন যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। গোপনীয়তার ব্যাপারগুলো পুরোপুরি ও এখনও বুঝে উঠতে পারে না।

—আচ্ছা চল, এই বাঁ দিকে। সুজিতদা ভাল সমর্থক। ট্যাক্স ইমপ্রুভমেন্ট অফিসে চাকরী করে।

—ভদ্রলোক ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন?

—না। চারজনে মেস করে আছে। ওই সামনের সাদা বাড়িটা। যাঃ দরজা বন্ধ। ঠিক আছে, পরে আলাপ করিয়ে দেবো। ভদ্রলোকের দারুণ রাজনৈতিক পড়াশোনা আছে। মার্কস লেনিন তো, বোধ হয়, পুরো পড়েছেন।

অশোকের অবাক লাগে, লোকে এত পড়ে, এত বুঝে দিব্যি চেনা ছকে জীবন কাটায় কী করে? রাজুর মনে হয় জহরদাই ভাল। বেশ কাছের লোক মনে হয়। অশোকদা যেন কাছে থেকেও অনেকটা দূরে।

-ক'টা বাজে এখন ?

—সাড়ে সাতটা আটটা হবে। তুমি কাল কখন বেরোবে ?

সকালের বাসে গেলে তো পৌছোতে পৌছোতে তুপুর হয়ে যাবে। গিয়ে খেতে পাবে না। অশোক বলে—সকালে নরেশের সঙ্গে দেখা করে খেয়েদেয়ে ডুপুরেব বাসে বেরিয়ে যাবো।

—ঠিক আছে। এই জায়গাটা ভাল করে চিনে নাও। এরপর থেকে তোমার শেল্টার ও শহর-সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এখানেই হবে। এই দোতালা বাড়িটা—উল্টোদিকের গলিতে ঢুকলে, সামনের সজনে গাছওয়ালা বাড়িটা।

—কার বাড়ি ?

—নিবারণবাবুর। মিনু, মানে ওনাব মেয়ে আমাদের সমর্থক। সোনা, মানে তোমাদের কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের রঞ্জিতদার এক আত্মীয়ের বাড়ি। সোনাদাও আগে এখানে এসে থেকেছে। মিনু, এই মিনু।

মিনু আর নাড়ু বারান্দায় বেরোয়। রাজু ও অশোক ঘরে ঢুকে চৌকির ওপব বসে। রাজু আলাপ করিয়ে দেয়। ঘবের চাবপাশে তাকায় অশোক।

—আমি আর দেরী করবো না।

বেড়ার ওপর টিন। ইলেকট্রিসিটি নেই। কেমন একটা গ্রাম গ্রাম আব-হাওয়া। শুধু সামনের দোতলায় তীব্র নিওন আলো জানান দিচ্ছে, এটা গ্রাম নয়, শহর। ঠিক সহজ হতে পারছে না অশোক। বাজু মিনুকে বলে—তাহলে অশোকদা থাকল রে। আমি চলি, অশোকদা।

৮

সময়টা ঘনঘোর বর্ষা। এক ছিটা জল পড়ে নি। মাঠ-ঘাট ফেটে হাঁ করে আছে। পুনর্ভবার জলেও টান ধরেছে। জল না পড়লে মাঠে কোন কাজ নেই। সারাদিন সূর্যের প্রচণ্ড দাপটে মানুষগুলো ঝিমোচ্ছে। রবিশস্যের শেষ পুঁজিও নিঃশেষিত। এই সময় এল মহাজনদের। ঘরের মরদগুলোর কোন কাজ নেই। দাওয়ায় তালপাতার চাটাইয়ের ওপর দিনভর ঘুমোবে। সারাক্ষণ গায়ের ওপর মাছি ভনভন করবে। ঘুমের ঘোরেই মাঝে মাঝে হাত-পা

নেড়ে মাছি তাডাবে। বাচ্চাগুলো মা'র কাছে খেতে চেয়ে চেয়ে কাঁদবে, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়বে। মেয়েরা কুটে দেবার জন্য ধান জোগাড়ের চেষ্টায় মহাজন আর ধনী চাষীদের বাডি ঘোরাঘুরি করবে। যার জুটবে সে একটানা ঢেঁকিতে পাড দেবে। আর সে আওয়াজে জেগে-থাকা মানুষের পেটে আরও জ্বালা বাড়বে। জ্যৈষ্ঠ শেষ অথচ আষাঢ় নামে নি তখনও।

হারান বিলিফের রাস্তা তৈরির কাজে গেছে। ভোব থেকে সন্ধ্যে অব্দি মাটি কাটবে। থানা থেকে দারোগা পুলিশেরা যাতে জীপে করেই সব গাঁয়ে পৌঁছোতে পারে, তার জন্য তৈরি হচ্ছে এই রাস্তাগুলো। রিলিফ—খরায়, বন্যায়। দিনান্তে বুডো আঙুলেব টিপ মেবে একটা টাকা, আর এক সের গম নিয়ে ফিববে হারান। সেই আশায় সবাই বসে আছে। কাল সকালের পব আর দানা-পানি পডে নি পেটে। নাবানের 'খেতি দেনা মা' কান্না থামাতে পঞ্চুদা বেদম পিটেছে। বৌদি কার বাডি থেকে চাট্টি আটা চেয়ে এনে জলে গুলে নারানকে খাইয়ে ঘুম পাডিয়েছে। পঞ্চুদা সেই যে বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে অশোকের। বেলা ক'টা? উঠোনে ছায়াটাব দিকে চায়, এগারোটা বারোটা হবে। বড ঘুম পাচ্ছে। মাথাটা ভীষণ ভাবি মনে হচ্ছে। শরীরের অন্য অংশগুলো হাল্কা লাগছে। পঞ্চুদা কাল একটা বলদ বেচবে। পাকুয়া হাট—মঙ্গলবার কাল। উঃ কাল বিকেলে আবাব পেট ভরে খাওয়া যাবে। হাট থেকে চাল কিনে আনবে পঞ্চুদা। পেটেব বাঁ দিক থেকে বুকের দিকে একটা ব্যথা পাক খেয়ে মোচড দিয়ে উঠল। একটু নুন আর ভাত। নাকে যেন গরম ভাতেব গন্ধ ভেসে আসছে। কারুর বাডিতে কী উনুনে ফ্যান পুডছে? বড সুন্দব এই পোডা গন্ধটা। মিনুদেব বাডিতেও সেদিন এই গন্ধটা পেয়েছিল। মিনু ছুটে রান্না ঘরে চলে গেল। অশোকের চোখ দুটো টেনে আসছে। সারা শরীরটা নেতিয়ে পড়েছে। ঘুম ঘুম, ঘুমিয়ে পডে অশোক।

সূর্য ডুবিডুবি করছে। পঞ্চুদা অনেকক্ষণ অশোকের মাথার কাছে বসে। মাঝে মাঝে অশোকের দিকে স্নেহের চোখে তাকাচ্ছে। বড মায়া পড়ে গেছে। কোন্ ঘরের ছেলে! বাড়িতে হয়ত রোজ মাছ-ভাত খেত। কত কষ্ট করছে! অশোক আস্তে আস্তে চোখ খোলে। সব অন্ধকার। হাত-পাগুলো নাড়তে পারছে না। এ কোথায় ও! দু'হাতে ভর দিয়ে অবাক চোখে পঞ্চুদার দিকে চায়। চারদিকটা চিনতে যেন কষ্ট হচ্ছে।

—ঘুম ভাঙছে মাস্টর? হারান আইবার ট্যাম হল।

পঞ্চুদার গলায় একটা ব্যথা। অশোকের মনে পড়ে ও পঞ্চুদার বাড়িতে। ও গ্রামে সংগঠন গড়তে এসেছে। গত ছত্রিশ ঘণ্টা পেটটা একদম খালি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে অশোক। এখানে আসার দিন সে কি ঘটা করে খাইয়েছিল মা! বড় বড় টুকরো পোনা মাছের ঝোল, মুরগীর মাংস, দই, রসগোল্লা। আর হোস্টেলে পরীক্ষার আগে যে ফিস্টটা হয়! অনিমেশের গেস্ট হিসেবে খেয়েছিল। পোলাও-মুরগী-আইস ক্রিম-আপেল আরও কত কি! কত নষ্ট করেছিল তখন! এখন যদি পেত একটা দানাও নষ্ট করত না। অশোকের মনে হয়—বেশ তো ছিলাম। রাজনীতি না করলেই বা কী ক্ষতি ছিল! বি.এ. তো পাশ করেই ছিল। আর দুটো বছরে এম. এ.। একটা প্রফেসারি বা মাস্টারি জুটত না! না হয় রাজনীতি করতই। শহরেও তো কাজ আছে! গ্রামে না এলে এই কষ্ট তো করতে হত না!

—মাস্টর, ক্ষুধায় কষ্ট হয়? কালই বলদটারে বেইচ্যা দিমু। প্যাটের জ্বালা বড় জ্বালা। গত বৎসর অন্যটা বিকেছি। এই ধর গিয়া ভাদ্দর মাসের পরথম হপ্তায়। এইবার এইটাও গেল। দর দাম পুছলাম। এক কুড়ি কম দুই শো'র বেশী হইব না।

মাথা খারাপ হয়ে যায়। দারিদ্র্যের অক্টোপাশ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আরও কষে ধরছে। এক অবস্থা সর্বত্র। গতকাল সকালে কালার ঘর থেকে খেয়ে এসেছিল। কালা ব্যাটা ক্ষেত-মজুর, মহাজনের কাছে ধার নিয়েছে। ব্যস, চাষের সময় মজুরী যখন একটু বাড়বে তখন ওকে কম মজুরীতে খাটতে হবে। সুদেআসলে তো মহাজন কেটে নেবেই, বেগার খাটিয়ে উপরিও উশুল করবে। বসনার কিছু জমি আছে, নিম্ন মধ্য-কৃষকই বলা যায়। জমি বাঁধা দিয়েছে। পঞ্চুদা বলেছিল—ক'দিন বসনার বাড়ি গিয়ে থাকো, ওখানে তবু খেতে পাবে। অশোক রাজি হয় নি। দুঃখের ভাগীদার না হলে আপনার লোক ভাববে কেন এরা?

ঘরে তেল নেই, তাই লণ্ঠন জ্বলে নি। গাঁয়ের খুব কম ঘরেই আলো জ্বলেছে। জোয়ান মরদেরা মাটি কাটতে গেছে। ফেরে নি এখনও। পঞ্চুদা হারানেরা ফিরছে কিনা দেখতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। খেতে না-পাওয়া চোখের দৃষ্টি বেশী দূর যাচ্ছে না। বটতলা অব্দি সিধে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কিছু ঠাওর করতে পারে না। গ্রামের অনেক ঘরেই চুলা ধরে নি। সবাই অপেক্ষা করে আছে—কখন মরদেরা ফিরবে।

৯

এই ধরণের ছোট শহবগুলোতে বড় ঝামেলা। সবাই সবাইকে চেনে। দুটো মনের কথা বলাব মত জায়গা প্রেমিক-প্রেমিকারা খুঁজে পায় না। বাড়িতে সবই জানে, বোঝে, তাই দীপু মিনুর তবু সুবিধে। কিন্তু ববিবার ছাড়া দীপুর সময় কই। আর সেদিন সকলেই বাড়িতে। অন্য দিন কোন ঠিক আছে, কোন দিন আটটা, কোন দিন ন'টা সাড়ে ন'টা। প্রেসের মালিক বীরেশ্বরবাবু কড়া লোক। যা পয়সা দেন, তাব সবটুকু উশুল কবতেও ভোলেন না। শহরের প্রথম সারির তিনচারটে প্রেসেব একটি। অনেক কাজ— সিনেমার পোস্টার, সরকারি অফিসের কাজ, বিল বই, পুজোর চাঁদার বসিদ, হরেকরকম। তাছাড়া মালিক কাস্তে ধানেব শীষ পার্টি করেন, তাই পার্টিব স্থানীয় পত্রিকাটাও ওদের প্রেস থেকেই ছাপা হয়ে থাকে। আব ভোটেব সময় তো কথাই নেই, কোন কোন দিন সারারাতও কাজ কবতে হয়। বড ক্লান্ত লাগে দীপুর। সকাল দশটায় টাইপেব বাক্সের দিকে তাকিয়ে সেই যে বসল, তিনটে চারটেব পর শিবদাঁড়া আর সোজা থাকতে চায় না। ন'টা সাড়ে নটা হয়ে গেলে শরীব চলতে অস্বীকার করে বসে। তাও যদি ওভাব-টাইম দিত। বাড়ি ফিবেও কানে মেসিনের আওয়াজ, আর চোখে ভাসে দ ক ম হরেক বর্ণ। সব ববিবার ও ছুটি পায় না। কিন্তু আজ ছুটি। বাদ বাকি দিনগুলো বীরেশ্বরের। আজকের দিনটা নিজের। আজ দীপু আর মিনু বেড়াতে যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে একটা জায়গা খুঁজে বার কবেছে।

বাঁশবাড়ি পেরিয়ে শহরের সীমানায় মহানন্দার ওপর ব্রীজ। ব্রীজ পেরিয়ে ওপারে নীচে যাওয়ার একটা সরু সিঁড়ি আছে। ওরা দুজনে সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে বালির চরের মাঝে ঘন হয়ে বসেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মহানন্দা শহরের দিকের পাড়টাকে কাটছে। খাড়া দাঁড়িয়ে ওপার, এপারে বিরাট চড়া।

—নদীর জল যেন দিন দিন কমছে, না ?

—হুঁ।

পেছনে পশ্চিমা গোয়ালাদের বস্তী। গরুমোষগুলো সবে ঘরে ফিরেছে বোধ হয়—তারস্বরে সব চেঁচাচ্ছে। চীৎকারে গলার ঘন্টির মিষ্টির আওয়াজটা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

—এই জানো, আমি রাজনীতি করছি, মানে পার্টি করছি।

সশব্দে ব্রীজটাকে কাঁপিয়ে একটা লোডেড ট্রাক চলে যায়।

—ওসব যাদের খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, তারা করে। তুমি ঝামেলায় যেও না।

শহরের আলোগুলো জলতে শুরু করেছে। দিনের শেষ আলোয় বিজলী বাতিগুলো ঘোলাটে দেখাচ্ছে। নদীর জলটা কালচে। ডানদিকে চরের মাঝে খানিকটা জল আটকা পড়ে আছে। অনেক শেওলা জলটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। বিচ্ছিরি গুমোট।

—কোন পার্টি ?

—না, মানে সেরকম কিছু না। বিপ্লব বিপ্লব তো অনেকেই বলে, তাই একটু পড়ে দেখছি।

—ছাইপাঁশ পড়ে কি লাভ ?

—পড়লে মোটেই দোষের কিছু নেই। তুমি পড়বে ? ভাল লাগবে দেখো। সব সত্যি কথা। কত নতুন কথা জানতে পারবে ! ভারতেও লড়াই চলছে, জানো।

মিনু শেষ চেষ্টা করে। দীপুকে যে বোঝাতেই হবে, ও কত কিছু ভেবে রেখেছিল। কীভাবে দীপুকে রাজনীতি দেবে। সব কেমন গুলিয়ে গেল। একটা কথাও গুছিয়ে বলতে পারল না।

—আমরাই তো ছাপি ওসব বই। গালভরা কথা কতগুলো। ও যেই মন্ত্রী হোক, আমাদের যে হাল তাই থাকবে।

—না না, আমাদের পার্টি মন্ত্রী হওয়ার, ভোট করার পার্টি না। পার্টি লড়াই করে দেশের পুরো ব্যবস্থাটাই পাল্‌টে দেবে।

—ঐ হল, শ্রেণীসংগ্রাম তো ! দেখো যে লঙ্কায় যাবে সেই রাবণ হবে। এ-ভূত কাঁধে চাপতে দিও না।

—দীপু সামনের খাড়া পাড়টার দিকে চেয়ে থাকে, মিনু যেন ওই পাড় বেয়ে অহেতুক ওঠার চেষ্টা করছে। মিনু বালিতে আঁচড় কেটে কীসব হিজি-বিজি ভালবাসা বিপ্লব লিখছে, আর হাত বুলিয়ে মুছে দিচ্ছে।

—এই, মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে ?

—উঁ।

—কাছে এসো।

—এই তো।

বিরক্তি লাগে মিনুর। এর চেয়ে বালি নিয়ে খেলা ভাল। সোনাকাকু, জহরদা, অশোকদা একদম আলাদা। দীপু একটুও ওদের মত নয়। অশোক যখন ওদের ঘরে বসল, মিনু ভাত চাপিয়ে এসেছিল। অশোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খেয়ালই ছিল না—কী পুড়ছে? অশোক জোরে নিঃশ্বাস টেনে বলেছিল। মিনু ছুটে রান্নাঘরে, না ভাত পোড়ে নি। হাঁড়ির গা বেয়ে ফ্যান উনুনে পড়ছিল।

—মিনু, আমি আর কিছু ভাবি না, শুধু তোমার আমার একটা ছোট্ট সংসার।

দীপু মিনুকে কাছে টেনে নেয়। মিনুর সারা শরীরটা ঝিমঝিম করছে। দূরের রেল ব্রীজটার ওপর দিয়ে একটা ট্রেন চলে যায়। দেখা যায় না এখান থেকে, শুধু ঝমঝম আওয়াজটা শোনা যায়। মিনুর বুকের ভেতরটা টন টন করছে—একটা ব্যথা, কাঁদতে ইচ্ছে করে ওর।

—অনেক রাত হয়েছে।

—উঠবে?

দীপু পকেট হাতড়ায়। একটা বেঁকে কুঁচকে যাওয়া সিগারেট বের করে। কিন্তু ধরাবার আগুন নেই ওর কাছে। মিনু বালি ঝেড়ে এগোতে থাকে।

১০

জেলা সংগঠনী কমিটির মিটিং শেষে জহর আর অশোক একসঙ্গে বেরিয়েছে। সেই সকালে শুরু হয়েছিল। সি. পি. সি-র নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট, শ্রীকাকুলামের লড়াইয়ের অগ্রগতি ও গ্রাম-শহরের কাজের নানান সমস্যা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। দুপুর একটা নাগাদ জমিয়ে চা আর পাঁউরুটি খেয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনায় মাথা ধরে গেছে। জহরই অশোককে নিয়ে বেরিয়েছে—চল একটু কাজও সেরে আসি, আড্ডাও দিয়ে আসি।

—সকালে উঠিয়া আজি হেরিয়াছিলাম কার মুখ, তব আগমন। রোগা হয়ে গেছো হে। চা চলবে তো?

—থামলে কেন? টা কি আসছে? দুপুরে ভাত পড়ে নি।

—তেল-মুড়ি চলবে? ভালমুট আনাচ্ছি।

—ফাইন। যাচ্ছো কোথায়?

—দাঁড়াও ব্যবস্থাটা করে আসি।

—ভাল সিমপ্যাথাইজার বুঝলি অশোক।

—হুঁ। অশোক তাকের বইগুলো দেখতে দেখতেই উত্তর দেয়।

—আলাপ করিয়ে দিই। গ্রামে নতুন আমদানী। কয়েক মাস হল। আর সুজিতদা।

—আমি আর রাজু আপনার এখান থেকে একদিন ফিরে গিয়েছি। কেউ ছিলেন না।

—অসম্ভব। পাশের রান্নাঘরটা চিনে নাও। সকাল-বিকাল পাঁচটা থেকে দশটা আমাদের রেবাদিকে পাবেই। যেকোন খবর দিয়ে যেতে পারো নির্ভয়ে। কারুর কানে যাবে না, এমনকি যাকে বলার কথা, তার কানেও নয়।

ওরা তিনজনেই হেসে ওঠে। রেবাদির বছর বারোর মেয়ে মালতি একটা কাঁধ উঁচু কলাইয়ের থালায় মুড়ি নিয়ে আসে। জহর হাত বাড়িয়ে থালাটা নিয়ে এক মুঠ তুলে নেয়।

—ওহে, অশোক, নাও ভাই।

—রবিদা কুনঠে গিছে?

মালদার ভাষাটা জহর প্রায় রপ্ত করে ফেলেছে।

—তিনটেই একসঙ্গে গেছে, সুভাষের পাত্রী দেখতে।

—ত তুমি গেলে না?

—দুঃ, এসব বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট।

—সুভাষদার এ-পাড়াতে কি একটা প্রেমের ঘটনা···

—হ্যাঁ, কিন্তু বৌয়ের বেলা সম্বন্ধ করে পাঁচ হাজার নগদ, ওমেগা ঘড়ি, সাইকেল, রেডিও।

—কেরানীদেরও বাজার দর আছে, বল।

—বেকার সমুদ্রে কেরানীরাও খড়কুটো। এতই ফেলনা ভাবছো?

—তো আর কী, তুমিও করে ফেল।

—হ্যাঁ ওইটাই বাকী আছে।

—কেন, অসুবিধেটা কী?

—বিপ্লব আর বিবাহ দুটো হয় না।

—কোন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এ-সিদ্ধান্তে উপনীত করল? এসব লাইন দিয়ে তুমি দেখছি হতাশ করে দেবে।

—সিরিয়াসলি। আজ চাকরী আছে, কাল তো যাবেই। তখন নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে তোমাদের মতই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে লাভ আছে?

—কিছু মনে করবেন না, আপনি এটা ঠিক বললেন কী?

—বলে ফেল। জহর আর আমিই তো বকবক করছি। তোমার কথা শোনা যাক।

—প্রথম আপত্তি, চাকরী গেলেই বেশী কাজ করবেন মানে? রাজনৈতিক কাজ যত বেশী করবেন ততই মনে হবে চাকরীর সময়টা নষ্ট হচ্ছে। তখন নিজে চাকরী ছাড়বেন। আর জীবন নষ্ট করা মানে? আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা এই একটা জায়গায়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস দেখুন, পার্টির নেতারা সবাই নিজেদের পরিবার-পরিজনকে রাজনীতির বাইরে রেখেছেন।

জহর অশোকের কথায় সায় দেয়।

—ছেলেমেয়েদের বড় বড় স্কুল-কলেজে পড়িয়ে মামা ধরে বড় চাকরীতে ঢুকিয়েছে। স্ত্রীরা হয় চাকরী নয় ভাতের হাঁড়ি ঠেলেছে। এই নেতারা নিজেরা যা করেছেন তাতে যদি মনে-প্রাণে তাঁদের বিশ্বাস থাকতো, যদি সততা থাকতো, তবে বাড়ির সবাইকেই পার্টির কাজে টেনে আনতেন। আমাদের জীবন আমরা নষ্ট করছি কী? তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রাজনৈতিক জীবনযাপন করলে নষ্টের প্রশ্ন আসে কেন? বিশ্বাসের অভাব থেকেই নয় কি?

—ভেবে দেখতে হবে। সুজিত হঠাৎ শার্টের হাতা গুটোনোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উঠে গিয়ে চায়ের তাড়া দিয়ে আসে। মালতি দু'হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঢোকে। চায়ে চুমুক দিয়ে সুজিত বলে—তাহলে জহর, এবার পাত্রী খুঁজতে বেরোই, কী বল?

জহরের কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সুস্মিতাকে রাজনীতিতে আনার চেষ্টা ও কম করে নি। কিন্তু বুর্জোয়া উচ্চাভিলাষের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি সুস্মিতা। এম. এস. সি করে আমেরিকা গিয়েছিল একটা রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে। তারপর আর খবর রাখে না।

—সুজিতদা, রবিদা এগিয়েছে একটুও ?

—টাকা পয়সা দিচ্ছে, সহকর্মীদের মধ্যে কথাবার্তাও বলছে টুকটাক।

অশোক ওদিকে লাও চাও-এর 'রিক্সাওয়ালা' খুলে শুয়ে পড়েছে।

—জহর, কাল থেকে সপ্তাহ খানেক মানিকচক অফিসে যাতায়াত করতে হবে। কোন কাজ ?

—সাতদিন, মানিকচক। এদিকে পার্টি-পত্রিকা কে পৌঁছে দেয় ?

—রাজু।

—রাজু তোমাকে দশ কপি কাগজ দিয়ে যাবে। মিলকি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার পশুপতিবাবুর কাছে পৌঁছে দিও। অশোক, ওঠ এবার।

অশোকের খেয়াল হয়, বইটা এখন শেষ করা যাবে না।

—সুজিতদা বইটা নিয়ে যাবো ?

—ফেরত পাবো তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ কালকেই পাঠিয়ে দেবো।

—কাল না হলেও চলবে। কিন্তু গ্রামে নিয়ে গিয়ে হারিও না।

—না, পার্টির নির্দেশ জানো না ? গ্রামে চেয়ারম্যানের উদ্ধৃতি, তিনটি লেখা আর পার্টির বইপত্র ছাড়া কিছু নিয়ে যাওয়া চলবে না।

—এটা কিন্তু তোমাদের আজব নিয়ম। তাহলে আর এত লোকে এত কিছু লিখল কেন ?

—গ্রামে যাওয়ার আগে পড়ে নেবে। বেশী বই-পত্র নিয়ে গেলে কৃষকরা ভাববে, রাজনীতি করাটা পণ্ডিতদের কাজ। তাছাড়া রাখার ও চলাফেরা করার বাস্তব অসুবিধেও আছে। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে অশোক।

জহর ভাবে দেবেন-এর মত কয়েকজন আছে গ্রামে এবং শহরেও, যাদের এতবার করে ও বলেছে যে অন্ততঃ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব', 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে', 'নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে', 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—এই গোটা কয়েক বই পড়ে নিতে। নিজেদের দর্শন কী, সমাজের দ্বন্দ্বগুলো কী, কী সমাজ গড়তে চাইছি, এগুলো না জেনে এরা যে কী করে কাজ করবে! এমনকি এই জন্যেই জেলা-কমিটির মিটিং-এরও আলোচনার রাজনৈতিক মান এত নীচু।

—তোমরা কোন্ দিকে যাবে ?

—অশোক এ-পাড়াতেই শেল্টারে চলে যাবে। আমি একটু ঘুরে ফিরে যাবো।

—চল আমিও ঘুরে আসি। বসে থেকে কী করবো ?

—তাড়াতাড়ি।

সুজিত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। টিউবওয়েল টেপাব আওয়াজ আসে। জহব পরের দিনের কাজগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে। বড ব্যস্ত মানুষ। হাঁফ ছাড়বার সময় কই ওব। অশোক মিটিং-এর কথাগুলো ভাবতে থাকে। ক্ষেত-মজুব ও গবীব চাষীদেব নিয়ে সংগঠন গডতে হবে। কিন্তু পার্টি-ইউনিট ছাডা আব কী ধবণেব সংগঠন হবে, অশোকেব কাছে সে ধাবণা পবিষ্কাব হয নি। সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখল কবতে হবে। হুনান কৃষক-আন্দোলন ও নকশাল-বাডিব ধরণের কৃষক-অভ্যুত্থান গডতে হবে। আগামী ফসল থেকেই ফসল দখলেব আন্দোলনের সশস্ত্র সংর্ঘষেব মধ্যে থেকে গেবিলা দলগুলো তৈবি কব শুরু কবতে হবে। এটা যে ঠিক কী কবে হবে, বুঝতে পাবে নি অশোক। আলোচনাতে ব্যাপারটা পবিষ্কাব হয় নি। আসলে কারুবই ঠিক এ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। ফসল কাটা নিয়ে এ-জেলাতে সশস্ত্র সংঘর্ষ শোধনবাদীবাও করেছে বহুবার। কিন্তু তাব থেকে গেবিলা দলগঠনেব পদ্ধতি এখনও অজানা। তবু ভাবতে ভাল লাগে, অশোকেব এই গেবিলা দলগুলোব একীকরনেব মাধ্যমে গণফৌজ তৈরি হবে।

সুজিত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে। ঘাডে খানিকটা পাউডার ছডিয়ে নেয়। ব্যস্ততাব সঙ্গে জামা পবে নেয়। জহব একটু বিশ্রামের আমেজ কাটাতে তৃপ্তির আডমোড়া ভাঙে। সুজিত চুল আঁচডে ফেলে।

—রেবাদি, ঘর আটকে দিলাম। আমি একটু ঘুরে আসি।

—আচ্ছা, রাত্ করবেন না বাবু।

রান্নাঘর থেকে রেবাদির আওয়াজটুকুই পাওয়া যায়।

—মালতি, ওঠ তো মা, এক বালতি জল নিয়ে আয়। বাবুরা বাইবাইলো। কখন ফিরবো ? রোজ রাত করি দেয়।

বড় আকালের বাজার। মালতির কাঠমিস্ত্রি বাবাকে মাসে অর্দ্ধেক দিনই বসে থাকতে হয়, কাজ পায় না। গত তিন দিন ধরে রেলস্টেশনের কাছে দোকানের দরজা তৈরির কাজ করছে। মানুষটা ঘরে ফিরে আজও বসে থাকবে। খিধেয় ঘুমিয়ে পড়বে। সেই কখন ফিরে রান্না করবে মালতিব মা।

গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তায় এখনও কাদা। সুজিত প্যান্ট বাঁচিয়ে হাঁটে। অশোকের শেল্টারটা চিনে নেয় সুজিত। অশোক মিনুদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। জহর আর সুজিত এগিয়ে যায়।

১১

খোকন অশোকদার কোলের কাছে ঘন হয়ে বসে।—তারপর। অশোক শুরু করে—তারপর তো দুই তিন পাঁচ আর আট চারবন্ধুতে সেই এগারো রাক্ষসের গুহার কাছে পৌঁছে গেল।

সন্তু ভূগোল বইটার দিকে তাকিয়েই আছে, কিন্তু কান পেতে শুনছে অশোকের গল্প। লণ্ঠনটা অন্ধকার তাড়াতে তাড়াতে হাঁপিয়ে উঠেছে। নাড়ু শুকনো লঙ্কা আর নুন কিনে ফিরল। মিনু রান্নাঘরে। সন্ধ্যেবেলা অশোক এসেছে দেখে মিনুর বাবা চারটে ডিম কিনে এনেছেন। চারটে ডিমে সাতজন। মিনুর মা'র শরীরটা ক'দিন ভাল যাচ্ছে। নিবারণবাবু মাঝে মাঝে রান্নার খোঁজ নিচ্ছেন মেয়ের কাছে।

মিনুর ঘরে অশোক আর খোকনের গল্প এগিয়ে চলেছে। অশোক আসলে এখনও মধ্যবিত্ত শেল্টারে একটু অস্বস্তিবোধ করে। তাই কী করি করি ভাবতে ভাবতে খোকনের সঙ্গে গপ্পো শুরু করেছিল। এখন নিজের জালে নিজেই জড়িয়েছে। বাচ্চাদের গল্প নিজের ছোটবেলার পরে আর পড়ার দরকার হয় নি—পড়েও নি। এখন বানিয়ে বানিয়ে বলতে হচ্ছে। আবার সব ব্যাপারেই যাতে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, সে-ব্যাপারেও সচেতন থাকতে চেষ্টা করছে।—এগারো রাক্ষসের শক্তি তো এগারো। এক দুই তিন এসব মানুষকে ধরে আর ঘাড় মটকায়। কিন্তু এরা তো এক সঙ্গে দুই তিন পাঁচ আর আট। যোগ করলে কত হয় খোকন?

খোকন তার ছোট আঙুলের কড়াতে দুই আর তিন যোগ করতে করতেই সন্তু বীরত্বের সঙ্গে বলে ওঠে—আঠারো। খোকন ক্ষেপে যায়—তোকে কে বলতে বলেছে? নিজের পড়া পারে না, গাধা। অশোক অতি কষ্টে দ্বন্দ্বের তীব্রতার সমাধান করে।

—আঠারো শক্তির চেয়ে তো এগারো শক্তি কম, তাই না? তাই একা দুই তিন বা অন্যরা যেটা পারত না যেই সবাই এক জায়গায় হল, ব্যাস। এগারোর সাধ্য কী! ওরা চারজনে করল কী, প্রথমে চুপ চুপ করে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। গিয়ে না দেখছে কী, পনেরো রাক্ষস চুপটি করে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ দেখে ওরা ভাবল, বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। যেই না রাক্ষস পাশ ফিরে

চোখ মেলেছে, ওরা চট করে একটা পাথরের আড়ালে। কী করা যায়, চার-জনে বুদ্ধি করছে। আট-এর বুদ্ধি খুব। ও বলল—ওই বাঁ-দিকের পাথরটাকে আমরা সবাই মিলে ঠেলে গুহার মুখটা বন্ধ করতে পারবো না? পাঁচ বলল—নিশ্চয়ই। তার আগে একটা কাজ করি। বড় বড় কালো পিঁপড়েগুলো ধরে গুহার মধ্যে ছেড়ে দেবো। দুই বলল—পিঁপড়ে ধরতে গেলে তো আমাদেরই কামড়াবে। মানপাতা ভেঙে ঠোঙা বানিয়ে ওতে ভরে নিয়ে যাই। খুব মজা হবে—তিন বলল—ভেতরে দুটো মৌচাক আছে, ও দুটোও ভেঙে দিয়ে আসবো।

অশোক গল্পকে আর টানতে পারছে না। এখন মনে হচ্ছে, নিবারণবাবুর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়াও সুবিধেজনক ছিল। যদিও নিবারণবাবুর প্রশ্নগুলোর নিজের উত্তরগুলো নিজেরই বড্ড পোষাকী, ভাবি ভাবি শোনাচ্ছিল। উনি বলছিলেন সোনা ওনাদের পুরো পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছেলে। কারণ হায়ার সেকেণ্ডারিতে ও সপ্তম স্থান অধিকার করেছিল। তাই সোনার বৈজ্ঞানিক বা আই. এ. এস. হওয়া উচিত ছিল। নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল। এ পোড়া দেশে কিছু হবার নয়, আমেরিকাতেই থেকে যাওয়া উচিত এসব ছেলেদের, তবু সেখানে কিছু কাজ করার সুযোগ পাবে। অবশ্য দেশের দশের ভালর জন্যে কাজ করছে, তা ভাল। এর আগেও তো অনেকে করেছে, পরে মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়েছে। অশোক বোঝাতে চেষ্টা করেছে আর প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেয়েছে।—কী হল অশোকদা? খোকন ছাড়বার পাত্র নয়। তারপর?

—হুঁ। তারপর যুক্তিমত ওর মৌচাক ভেঙে পিঁপড়ে ছেড়ে ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। আর হেঁইয়ো মারো হেঁইয়ো মারো করে ভারী পাথরটা গুহার মুখে চাপা দিয়ে দিল। ব্যাস, ওদিকে ভেতরে কী দারুণ অবস্থা। প্রথমে তো রাক্ষসকে একটা দুটো মৌমাছি আর পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। দু'থাপ্পড়ে দুটো দশটাকে মেরে রাক্ষসটা পাশ ফিরে শুল। তারপর যেই না হাজার হাজার পিঁপড়ে আর মৌমাছি কামড়াতে শুরু করল, বাবাগো মাগো বলে রাক্ষস তো চীৎকার শুরু করলো। গুহা থেকে বেরোনোর কত চেষ্টাই না করলো। কিন্তু নিরুপায়। ধীরে ধীরে পিঁপড়ে আর মৌমাছির বিষে রাক্ষস মরে গেল। আর চারবন্ধুর সে কী আনন্দ!

—মিনু, রান্না হল তোর?

—হ্যাঁ বাবা, এস এবার। অশোকদার রাক্ষস মরেছে কিনা দেখো।

—হ্যাঁ। তারপর বুঝলি তো দেশের লোকের সে কী মজা। কেউ আর রক্ত চুষে খাবে না। সবাই মিলেমিশে আনন্দে থাকতে লাগল।

মিনুর বাবা, তিন ভাই আর অশোক খেতে বসেছে। উনুনের নিবু নিবু আঁচ, লণ্ঠনের আলো আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের ছিট ছিট আলো, আর অন্ধকারে রান্নাঘরের পরিবেশটা রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। সবাই চুপচাপ খাচ্ছে। তরকারিটা, ডিমের ঝোলটা কেমন হয়েছে, জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছে মিনুর। খোকন মাঝে মাঝেই অশোকের পেছনে ঘরের কোণের জমাট অন্ধকারটার দিকে তাকাচ্ছে।

—রাক্ষসটা তো মরেই গেছে, না অশোকদা।

—হুঁ। আরো অনেক রাক্ষস বেঁচে আছে। মারতে হবে আমাদের।

ইস্, অশোকদা যদি খোকনের মনের কথাটা বুঝতো। ওর অশোকদা কী দেশের সব ক'টা রাক্ষসকে মেরে ফেলতে পারে না? তাহলে আর ভয় ভয় করতো না।

সবার পাতে আধখানা, পুরো ডিমটা খেতে বড় অস্বস্তি লাগছে অশোকের।

—আরেকটু ভাত দেক না, বাবা। তোমার খেতে কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না না, মেসোমশাই। এ তো রাজখানা! গত কয়েকদিন কী খেয়েছি জানেন? পাট-পাতা সেদ্ধ আর ভাত।

সবাই একটু অবাক চোখে অশোকের দিকে চায়। গৌতমের খুব খারাপ লাগছে। থালার ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে ভাত নাড়াচাড়া করে ও নিজের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে। এক মাথা বড় বড় চুল কপালের ওপর ভেঙ্গে পড়েছে। নিজের কষ্ট স্বীকার করাকে তুলে ধরার জন্য ও বলে নি। কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে, ঠিক খাওয়ার সময়টাতে এভাবে বলে যেন নিজেকে মহান প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করল। মিনুর মনে অদ্ভুত এক মাতৃস্নেহ কাজ করছে। এই ছেলেগুলো স্রেফ্ পরের জন্য কত কষ্টই না করছে। ভারি সরল ছেলেটা।

—আরে থাক্ থাক্। ও আমি তুলে নেব।

—রোজকার অভ্যেস।

—আগের দিন কিন্তু ছিল না।

—তারপরে গ্রামে আরো কিছুদিন কেটেছে যে।

—বেশ, এখন উঠে পড়ুন তো।

দীনবন্ধুর দোকানের ধারের ডাল আর সজনেফুলের চচ্চড়ি, ভাত খেয়েও দিন কাটে মিনুদের। কিন্তু অশোকদের কথা আলাদা। কলকাতায় বাড়িতে নিশ্চয়ই ভাল-মন্দ খেয়ে অভ্যেস। মিনুর খাওয়া শেষ। অশোকের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করবে, ঠিক করে মিনু। বাড়ির জন্য মন খারাপ করে না ছেলেগুলোর ? বাসন মাজা সেরে রান্নাঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় মিনু। ব্যাস, আজকের মত কাজ শেষ। অশোকদার মশারীটা টাঙিয়ে দিতে হবে। ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায় মিনু। অশোক যেন ধ্যানস্থ, সারা ঘরটা অন্ধকার, অন্ধকার লণ্ঠনের সবটুকু আলো যেন ওর মুখটা শুষে নিয়েছে, বেশ লাগছে। কী যেন লিখছে, বাড়িতে চিঠি ? কে জানে, হয়ত কলকাতায় প্রেমিকা আছে, নিবিষ্ট হয়ে তাকেই চিঠি লিখছে।

—কাকে চিঠি লিখছেন ?

—উঁ। চমকে পেছন ফেরে অশোক। এই একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেটাই একটু ঠিকঠাক করছি।

—আমি শুনতে পারি ?

—শুনবে, বেশ, পড়ছি শোন।

—বুঝবো ?

—কেন ? কবিতা বোঝা কী শক্ত ?

—না, মানে আধুনিক কবিতার তো মানেই বুঝতে পারি না।

—ওসব ভাড়াটে লেখকদের বজ্জাতি। দুর্বোধ্যতাই মূলধন ওদের। লড়াই।

মুঠোয় মুক্তির আকাশ চাও
শিরদাঁড়া সোজা করো—
ওপরে, আরো ওপরে।

যদি একা উড়তে চাও
জড় ছেড়ে
প্রাণরসের অভাবে
মৃত্যু নিশ্চিত।

তাই—
আরো ওপরে পৌঁছোতে
শেকড় বিস্তার করো
ভেতরে, আরো ভেতরে
পৃথিবীর মত মানুষের গভীরে।

রাত অনেক। পৃথিবীর সব শব্দ ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে। অশোকের সংকোচ হচ্ছে। মিনুর যদি ভাল না লেগে থাকে। এটাও কী দুর্বোধ্য মনে হয়েছে? মিনুর কানে বহুদূর থেকে হাজার মানুষের মিলিত কোলাহল আর উৎসবের বাজনার শব্দ ভেসে আসছে।—আমি সহজ করে লিখবার চেষ্টা করেছি, জান। কিন্তু মানুষের সঙ্গে ততটা একাত্ম হতে পারি নি তো, তাই মানুষের কথা তাদের ভাষায় এখনও বলতে পারি না হয়ত।

মিনুর চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—'পাভেল', না না তোমরা পারো। তোমরা অদ্ভুত, তোমাদের দেখে নতুন করে জীবন শুরু করতে ইচ্ছে হয়। মিনু যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা অপরিচিত দেশের পথে পা বাড়াচ্ছে। দীপু, দীপু কী অন্ধ! দুনিয়া বদলাচ্ছে, নতুন দুনিয়া গড়ার কাজে দীপু এগিয়ে আসবে না! নিজের গুটির মধ্যে গুটিপোকার মত বসে থাকা, না না! আজ সারা দুনিয়ার মানুষ লড়ছে। আজ শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা নয়, ছড়াতে হবে, নিজের পরিধি ভেঙ্গে হাজার লাখ আমির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে। মিনুর রক্তে এক বাঁধভাঙ্গার নেশা।

অশোক মিনুর দিকে তাকিয়ে থাকে। মিনু যেন কোন সুদূরে। কী এক সংকল্প দানা বাঁধছে। পলকহীন চোখে কী দেখছে ও? অশোক মিনুকে নতুন করে দেখতে থাকে।

১২

পাঁচটি মেয়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে এই প্রথম বসেছিল। মিনু আর শিখা একসঙ্গে বেরিয়েছে। শিখাকে মিনু আগে থেকেই চিনত। ওর চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়ত। এখন কলেজে। বাকি তিনজনের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। একজন নরেশদার বোন—ভারতী। নরেশদাই মিনুদের সঙ্গে কাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। কেয়া মেয়েটা বেশ, কত সহজে আপন হয়ে গেল। কেয়ার বন্ধু অনসূয়াকে ভাল লাগে নি মিনুর। সুন্দরী বলে দেমাক আছে। বিপ্লবী রাজনীতি করতে এসেও এগুলো ছাড়তে পারল না। দেখতে মিনু নিজেও হতকুচ্ছিত নয়। মিনু শিখাকে বলে—একটু তাড়াতাড়ি পা চালা, বাড়ি গিয়ে রাঁধতে হবে।

—আজ তো রবিবার। একটু দেরী হলে কী আছে?

—না, তাও। শোন, আসছে রবিবার তুই আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিস তো?

—হুঁ। স্টাডি-ক্লাশগুলো ফাঁকি দিস না কিন্তু।

—না না। বাজনীতিব তো কিছুই জানি না। ফাঁকি দিলে চলবে কেন?

—জিনিসপত্র বা খবরাখবর আনা-নেওয়ার কাজ বেশী কবে দিলে ভাল হয়। আমি কলেজ পালিয়ে দিব্যি করতে পাববো।

—আমাবও অনেক কাজ কবতে ইচ্ছে কবে। পাশ কবে গেলে আমিও কলেজে ভর্তি হব।

হঠাৎ কথাটা বলেই বুকের ভেতর যেন একটা ধাক্কা খায় মিনু। দীপুব কাছ থেকে ও দূবে সরে যাচ্ছে। দীপুকে ও জীবনসঙ্গী হিসেবে ভাবতে পাবছে না। কলেজে পডাব খবচ আসবে কোত্থেকে?'

—এই মিনু, দেখ আমার দাদা। ওই যে বে নীল শার্ট গায়ে আবেকটা ছেলের ঘাডে হাত দিয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি তো তোর দাদাকে।

—দাদা আমাদের রাজনীতি করে, জানিস তো। দাদাই আমাকে বাজনীতি দিয়েছে। সঙ্গের ছেলেটাকে চিনিস?

—না।

—গোবিন্দদা। খুব ভাল কর্মী। পডাশুনা ছেডে দিয়েছে। গ্রামে চলে যাবে বোধ হয়।

—কলকাতা থেকে যারা গ্রামে কাজ করতে এসেছে, তাদের কাউকে চিনিস?

—দেবেনদাকে চিনি। শহরে এলে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে ওঠেন। আর রোগামত একজন দাদাব খোঁজে একদিন এসেছিলেন। মনে হল বাইরের কেউ, নাম জানি না।

—খুব পাতলা চুল? সামনের দিকে একটু টাক মত আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—ওই তো জহরদা।

—তাই নাকি, ইস্! বাইরে বাইরেই চলে গেলেন। জহরদার কথা দাদাদের কাছে খুব শুনেছি। জহরদারই নাকি গোপনে চীন যাওয়ার কথা হচ্ছে।

—শিখা, রাস্তায় এভাবে আলোচনা করাটা ঠিক নয়। আমাদের বড় আলগা কথা বলা অভ্যেস থেকে গেছে।

দুজনেই একটু গম্ভীর হয়ে যায়। মিনুর আর অশোকের কথা বলতে ইচ্ছে করে না। অশোক সবার চোখের আড়ালে। অশোককে যে মিনু আবিষ্কার করেছে ওর ছোট্ট ঘরে।

—ঠিক বলেছিস, নরেশদাকে দেখলি না, আমাদের কাকে কী কাজ দেবেন, সেটা সবার সামনে বললেন না।

মিনুর বড় অদ্ভুত লাগে। সবাই সবাইকে কত ভালবাসে। অথচ নিজেদের মধ্যেও এত গোপনীয়তা। মিনুদের বাড়ির গলি এসে গেছে।

—একটু এগিয়ে দিবি না?

—না রে, অনেক দেরী হয়ে গেছে। মিনু বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। একটু ক্লান্ত লাগছে ওর। গিয়ে রান্নাটা যদি না করতে হত। নিজের ঘরে ঢুকেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মিনু। বাবার অফিসের কোন ছোকরা সহকর্মী বোধ হয়। কেউ নেই। বাবা বাজার করে ফেরে নি এখনো। নাড়ু-সন্তু খেলতে বেরিয়ে গেছে। খোকন ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা মাটির টিয়া আর প্লাস্টিকের মেয়ে নিয়ে খেলছে।

—মা।

তন্দ্রাজড়িত চোখে মা তাকায়। একটা কঙ্কালের ওপর কেউ চামড়া মুড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। মা'র দিকে তাকালেই অস্বস্তি হয় ওর।

—তোর জন্য কে জানি অপেক্ষা করছে। এই একটু আগে এসেছে। জড়ানো গলায় উত্তর আসে। মিনু ঠিক ভেবে পায় না, কে হতে পারে!

—আপনি, মানে আমি ঠিক···

—হ্যাঁ, আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি অশোকের বন্ধু, মানে ওদের সমর্থক আর কী।

মিনুর হঠাৎ মনে হয় পুলিশের লোক নাতো? সাবধানে কথা বলতে হবে।

—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।

—হুঁ। একটা ছোট্ট কাজে এসেছি।

—বেশ তো বলুন, কী করতে পারি?

—অশোক আমার একটা বই এনেছিল। বলেছিল, এখান থেকে নিয়ে নিতে।

—কী বই ?

—'রিক্সাওয়ালা'।

—ওঃ, আপনিই কী সুজিতবাবু ?

মিনু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এতক্ষণ বুক ঢিপঢিপ করছিল।—আপনার তো অনেকদিন আগেই এসে নিয়ে যাবার কথা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক সময় করে উঠতে পারি নি।

—ভালই হযেছে অবশ্য। আমাবও এর মধ্যে পডা হয়ে গেছে।

দুজনেই আব কথা খুঁজে পাচ্ছে না। মিনু তাক থেকে বইটা সুজিতের হাতে দেয়।

—আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

সুজিত কিছুক্ষণ বইটা নাডাচাডা কবে। ঘরেব এপাশ ওপাশ দেখে। উঠোনের দিকে জানালাব বাতাব ফাঁক দিয়ে রান্নাঘবেব দবজাটা দেখা যাচ্ছে। একটুকবো শাডি—গোলাপী একটা বঙেব ছোপ, ধোঁযাভবা রান্নাঘবে। চোখ ঘষে এসে দাঁডায় মিনু।

—চা খাবেন ?

—না থাক। এত বেলায়।

—আপনাব মিনু নামটা জানি।

—ভাল নাম ? মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্ত।

দু'জনেই আবাব চুপচাপ। সুজিত ওঠার তাগিদ অনুভব করে।

—আমি এবাব উঠবো।

—বসবেন না, চা না খেয়ে···

—না না, সে আরেক দিন এসে খেয়ে যাবো।

—কোথায় থাকেন আপনি ?

—এই তো, গলি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে একটু এগোলেই মিত্তিরদেব বাডিটার পাশেই। সাদা একতলা।

—কাছেই তো। চলে আসবেন।

—আচ্ছা, আজ চলি।

সুজিত বেরিয়ে যায়। হাওয়া দিচ্ছে। সজনের পাতাগুলো একে অন্যের গায়ে লুটিয়ে পডছে। একটানা সরসর শব্দ। মিনুর দাঁডিয়ে থাকার সময় নেই। চটপট শাডিটা বদলে নেয়। অনেক কাজ পড়ে আছে।

১৩

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে নরেশ। নিজের ঘরে ঢুকেই বিছানার তলা, বাক্স, তাক সব ঘেঁটে এক রাশ কাগজ বই-পত্র মেঝেতে ছড়িয়ে বসেছে। ঠিক সামলে উঠতে পারছে না। জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোয় নীল আকাশটার দিকে তাকায় একবার। ছাড়া ছাড়া মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। বর্ষা প্রায় শেষ। বাঁচা গেছে—বড় অসুবিধে করে। দেওয়ালে লেখা যায় না, পোস্টারিং করা যায় না। শহরে বৃষ্টির কী দরকার বাবা! যা-না গ্রামে যতঃখুশি হ গিয়ে। কয়েকদিন আগের কথা ভেবেই বৃষ্টির ওপর এত রাগ ওর। সারারাত জেগে ও প্রশান্ত, রাজু, চঞ্চল, গোবিন্দ, এমনকি বিষ্ণুও ছিল—সবাই মিলে সুন্দর করে লিখে এল এত জায়গায়। শেষরাতে সব ধুয়ে ঝাপসা করে দিল।

গত বছর বি. এ. পাশ করেছে নরেশ। চাকরিবাকরি করবে না ঠিক করে ফেলেছে। শহরের সংগঠনের কাজের চাপে গ্রামে যাবো যাবো করেও যেতে পারছে না। জহরও ওকে শহরটাকে আরও সংগঠিত করে তবেই যেতে বলছে। নানান দায়িত্বের চাপে ওকে আজকাল গম্ভীর দেখায়। এখন মনে একটা খুশীর আমেজ।

—ভারতী, এই ভারতী।

—কি রে, দাদা। বাব্বাঃ একেবারে দোকান সাজিয়ে বসেছিস যে রে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক কাজ আছে।

—সে তো জানিই। কাজের দশগুণ ব্যস্ততা।

—ইয়ার্কি হচ্ছে, না। একটা দারুণ খবর আছে। মিলকীতে পরশু বিকেলে যা হয়েছে না, কৃষকেরা আমাদের শেখাচ্ছে, বুঝলি।

—হয়েছে কী, বল না?

—পঞ্চানন সাহা ওখানকার সবচেয়ে বড় জোতদার মহাজন। ওর বেনামী জমির বাঁশঝাড় কৃষকরা আমাদের পার্টির নেতৃত্বে দখল করে সমস্ত বাঁশ কেটে এলাকার গরীব চাষীদের ঘর মেরামতের জন্য বিলিয়ে দিয়েছে।

ভারতীর খুশী লাগে। কোথায় যে কতটুকু কাজ হয়েছে, ওপর ওপর তো

কিছুই বোঝা যায় না। এ-রকম দু'একটা ঘটনা ঘটলে সবাই বেশ প্রেরণা পায়। দাদাব আনন্দ-উজ্জ্বল অভিব্যক্তিটুকুও ওর ভাল লাগে।

—তা তুই এখন কাগজ-পত্তব নিয়ে বসলি কেন ?

জানলার দিকে একবাব তাকিয়ে নিয়ে গলা নামিয়ে বলে নবেশ—তোর কা ধারণা, রাষ্ট্রযন্ত্র চুপ করে বসে থাকবে ? আগামী ফসলেব ওপর দখল রাখাব আওয়াজ তুলছি আমবা। মহাজনদের সুদ বন্ধ কবো বলছি। শহবের সব যুব-সংগঠনের ছেলেরা প্রোগ্রাম নিচ্ছে ছোট ছোট দল কবে গ্রামে বেড-গার্ড অ্যাকশনে যাবে। কৃষি-বিপ্লবের বাজনীতি, চেয়ারম্যানেব চিন্তাধাবা প্রচাব করবে। আর শত্রুপক্ষ কিছু বলবে না ?

—তো তোব এই গোছ-গাছ কেন ?

—গায়ে আঁচটি লাগবে না, বিপ্লবও কববে, আব কদ্দিন বাবা ? দলিল-পত্র সব সরিয়ে দিচ্ছি বাড়ি থেকে।

দাদার জন্য চিন্তা হয় ভারতীর। বড় বেশী পরিচিত হয়ে গেছে। প্রথম দিকে বক্তৃতা দিয়ে-টিয়ে—শহরসুদ্ধ লোক জানে, ও বেশ নেতা। ধরবে না তো ! একটা অজানা আশংকায় বুক কেঁপে ওঠে ওর।

—এই একটু হাত লাগাতো। মিলিয়ে ফেলিস না। ওদিককারগুলো একসঙ্গে পিনে আটকাবি।

ভারতী কাজগুলো করে ফেলেছে। নরেশ কাকে চিঠি লেখায়, না একটা প্রচারপত্রের খসড়া লেখায় ব্যস্ত। ভারি ভাল দাদাটা। ভারতীর মনে হয়, জহরদার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে দাদার। জহবদা কত সহজে আপন হয়ে যায়। 'আমাকে দেখো' বলে ভেরী বাজাতে হয় না। জহরদার নিজের বোন দুটো কী ? ভারতীর মনে আছে—জহরদা দাদাকে আর ওকে নিজের বাড়ির কথা বলেছিল অনেকদিন আগে। ভাইও নাকি বিপক্ষে। অবশ্য হবেই তো। বাড়িতে ভাল ছেলে বলে জহরদাকে মাথায় করে রাখত। বহু-দিনের বহু উপেক্ষা, বহু মার খাওয়া অহং ভাইয়ের ক্ষেত্রে যে হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছিল, আজ তার বদলা নিচ্ছে। জহরদাই এসব কথা বলেছিল—বুঝি তো সবই, কিন্তু আজ আর আমার এসব ছোটো-খাটো দ্বন্দ্বের জন্য দেবার মত সময় নেই। জহরদা—জহরদাকে যেন কোন ময়লাই ছুঁতে পারে না। সারা অস্তিত্ব জুড়ে মিষ্টি একটা আবেশ অনুভব করতে থাকে ভারতী।

—এই ভারতী। কি রে ? জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিস নাকি ?

—যাঃ। যেন ধরা পড়ে গেছে। লজ্জা চাপার চেষ্টা ওর চোখেমুখে।

—শোন, তোদের মেয়েদেরকে বিপদের ঝুঁকি আছে এমন কাজ দিলে করবে তো?

—দিয়েই দেখ না।

—দু'জন মেয়ে ঠিক কর। পরশু সকাল আটটার আগেই রওনা দিতে হবে। ওল্ড মালদা স্টেশনে পৌনে ন'টা নাগাদ কাটিহার থেকে যে ট্রেনটা আসে, তার একদম পেছনের বগিতে উঠবে। সঙ্গে গোবিন্দ থাকবে। ওখানে বসে থাকা একটা ছেলের কাছ থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে মেয়েদের দিয়ে দেবে। ছেলেরা দু'জন সাইকেলে চলে আসবে। তোবা ব্যাগটা নিয়ে রিক্সাতে চলে আসবি।

—কী ব্যাপার রে? কী থাকবে ব্যাগে?

—বোমের মশলা। তারপর চঞ্চলের বাড়ি পৌছে দিবি।

—ফাটবে না তো?

—না না। আমরাই আনতাম। কিন্তু স্টেশনগুলোতে মনে হচ্ছে ওরা নজর রাখছে। যুবকের কাঁধে ব্যাগ দেখে সার্চ করতে পারে। তাই, তোদের কেউ খেয়াল করবে না।

ভারতী ভাবছে, কাকে নেওয়া যায়। ও নিজে একজন, আর শিখা, কেয়া, না মিনু। মিনুই ভাল।

—আর শোন।

—ভারতীর কপালে চিন্তার রেখা দেখে নরেশ একটু থামে। বড় আদরের বোনটা ওর। ঠিক যুদ্ধের ভেতর টেনে আনতে ইচ্ছে হয় না। যদি কিছু অঘটন ঘটে? এরা কী পারবে ধ্বংস দেখতে, ধ্বংস করতে?—কী ভাবছিস রে?

—এই কাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো? মিনুই ভাল, দারুণ শক্ত মেয়ে।

—সেই ভাল। আরেকজনকে দরকার যে, আমি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেলে যে আমার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ রাখবে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড শুনলে ভারতীর এখনও হাসি পায়।—মাটির তলায় ঢুকে বসে থাকবি নাকি?

—ভাগ, রাতে টুকটাক ঘোরাফেরা করবো। কিন্তু দিনে একদম বেরোনো যাবে না।

—দাদা, একটা কথা বলবো ?

—কী ?

ভারতী চুপচাপ মিটিমিটি হাসছে।

—কী, বলবি ?

—তোর সঙ্গে যোগাযোগটা কেয়াই রাখবে। ভারি মিষ্টি মেয়েটা।

নরেশ বাজে কাগজগুলো ছিঁড়ছে। ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় মেঝেতে একটা স্তূপ হয়েছে। ভারতী ভাবে, কী দাদাটা, এতেও বুঝছে না। নরেশ অন্যমনস্কভাবে বলে—কালকে সন্ধ্যেবেলা কেয়াকে তাহলে এখানে আসতে বলিস, আমার শেল্টারটা চিনিয়ে দেবো।

—কাল সন্ধ্যেবেলা তোরা দু'জনে বেরোবি ?

নরেশ মুখ তুলে ভারতীর দিকে তাকায়। ভারতীর চোখে যেন কিসের ইঙ্গিত।

—এক থাপ্পড় লাগাবো।

ভারতী এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নিজের ঘরে গিরে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। একটু বাদেই উঠে পড়ে। চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়ায়। হঠাৎ ফুল স্পীডে পাখাটা চালিয়ে দেয়। বই-খাতা, আলনায় শাড়ি ব্লাউজ, ভারতীর চুল-আঁচল সব এলোমেলো হতে থাকে। জহরদা ঠিক দাদার মত, কিচ্ছু বোঝে না।

নরেশ টুকরো কাগজগুলো উনোন ধরানোর কাগজের জায়গায় ফেলে আসে। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। জহর অনেকগুলো কাজ দিয়ে গিয়েছিল। এ-মাসের পুরো কালেকশনটা করা হয় নি এখনো। আচ্ছা, ভারতী যে বলছিল —কেয়া, কেয়া কোন মেয়েটা ? নরেশ মেয়েদের মুখগুলো মনে করবার চেষ্টা করে। শিখা, মিনু, অনসূয়া—সবার মুখ মনে করতে পারছে। কিন্তু কেয়া যেন, যেন বহুদূর থেকে আবছা একটা মুখ স্পষ্ট হতে হতেও হচ্ছে না। নরেশের দাদা দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে।

—তুই বড় এ-সময় বাড়িতে ?

—এমনি।

খোকাদা স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ক্রিকেট ছাড়া মাথায় কিচ্ছু ঘোরে না। ভাল ব্যাটসম্যান—জেলা-টিমে খেলে। নরেশও ভালই খেলত। কলেজ টিমের হয়ে খেলেছে। আজকাল আর হয়ে ওঠে না, সময় কই !

—বাবা ফেরে নি, না রে ?

—না, সুধীর কাকার আড্ডায়।

—তোদের পেছনে সমর্থন বেশ বাড়ছে। আজ অফিসে দু'জন সহকর্মী দেখলাম, তোদের হয়ে খুব তর্ক করছে। সবাই দেখছি তোদের পার্টিকে একটা ব্যাপারে খুব শ্রদ্ধা করে যে এরা ধাপ্পাবাজ নয়। ভোট করে গদী-দখলের ধান্ধা…

—খোকা, ফিরেই গল্প জুড়লি ? মা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘর-ভর্তি ধোঁয়া, তবু নরেশ সিগারেট লুকোয়।—হাত-মুখ ধুয়ে নে। নরু আজ রাতে বেরোবি না তো ?

—না।

—ভাল, শরীরটা কী হচ্ছে দিন দিন ? রোজ রোজ দেশোদ্ধার করতে হবে না। খেয়ে-দেয়ে ঘুমো।

নরেশ সত্যিই মাঝে মাঝে বড় ক্লান্ত বোধ করে আজকাল। আজ ঘুমোবে, আজ আর কোন কাজ নেই।

১৪

কিছুদিন ধরে অশোক কালাদের গ্রামে আছে। ডোবা অঞ্চলে নমশূদ্রদের মধ্যে সংগঠনের কাজ একটু এগিয়েছে। অশোক তাই রাজবংশীদের মধ্যে নিজের ও জহর ওকে সাঁওতালদের মধ্যে যে যোগাযোগগুলো দিয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ শুরু করার চেষ্টা করছে। টাঙন আর পুনর্ভবার মাঝে প্রায় বারো মাইল চওড়া স্থলভাগ। দু'দিকে ডোবা অঞ্চলে নমশূদ্ররা, আর মাঝে ডাঙ্গিতে সাঁওতালেরা। মাঝে ডোবা আর ডাঙ্গার ধার ধরে রাজবংশীরা। হবিবপুর আর বামনগোলা দুটো থানার বুক চিরে কালো পীচের রাস্তাটা মালদা টাউন থেকে সোজা পাকুয়া। পাকুয়া থেকে উত্তর-পুবে গিয়ে নালাগোলার কাছে পশ্চিমদিনাজপুর সীমান্তে হারিয়ে গেছে। আরেকটা রাস্তা পাকুয়া থেকে বাঁয়ে ঘুরে বামনগোলা থানা সদরের কাছে টাঙনে আটকা পড়ে গেছে। নদী পার হলে গাজোল। সাঁওতালদের ওপর শোধনবাদী পার্টিগুলোর প্রভাব বেশী। এই এলাকার মানুষগুলোকে নিয়ে, তাদের সংগ্রামী শক্তিকে নিয়ে এই বদমাইশেরা কী ছিনিমিনিই না

খেলেছে! সাঁওতালদের সঙ্গে নমশূদ্রদের বিরোধ, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ জোর করে জিইয়ে রাখছে এই ভোটের পার্টিগুলো। নমশূদ্ররা দেশভাগের পর এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছিল। সামান্য খাস জমি দিয়ে স্থায়ীভাবে শোষিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে কংগ্রেস সরকার। তাই এরা কংগ্রেসকেই ভোট দিত। ডোবা অঞ্চলের পতিত জমি নমশূদ্রদের হাতে চলে গেছে। দশ-বিশজনের জমি আবার দু-একজনের হাতে জড়ো হয়েছে। সাঁওতাল চাষীরা জমির ক্ষিদেয় উত্তপ্ত। তাদের মুখের গ্রাস অন্যদের কাছে চলে যেতে দেখে তারা রিফিউজীবিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আর এদ্দিনের কমিউনিস্ট নামধারী পার্টি নমশূদ্রদের ভোট পাচ্ছে না, তাই সাঁওতালদের ক্ষেপিয়েছে। নমশূদ্রদের গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে, জ্বালিয়েও দিয়েছে। নমশূদ্ররাও বদলা নিতে কসুর করে নি। সাঁওতালদের মিলিত শক্তির মোকাবিলা করতে পারে নি, তাই একক সাঁওতাল ধারের কাছে পেলেই পিটিয়েছে। ডান-পার্টির সাঁওতালরা আবার বাম-পার্টির সাঁওতালদের বিরুদ্ধে লড়ছে। ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল—জোতদারদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার কী চেষ্টা! কিন্তু তবু আটকে থাকে নি। লড়াইয়ের রাশ অনেক সময় নেতারা টেনে রাখতে পারে নি। কোর্ট কাছারী আইন-আদালতের ঘুরপাক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে—কৃষকের বর্শার ফলা জোতদারের বুক ফুঁড়েছে। সাঁওতালদের তীরের ফলার বিষ প্রাণ নিয়েছে বেশ কয়েকজন শ্রেণীশত্রুর। অমনি শান্তিজলের ফেরিওয়ালারা তৎপর হয়ে উঠেছে।

আকাশে আবার মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে। শেষ বর্ষা। ডাঙ্গিতে ফসল ভাল হবে না। আরেকটু জলের দরকার ছিল। ডোবার মানুষ মহা খুশী—বান হয় নি এবার। মাঝ দুপুর, চারদিক নিশ্চুপ। কান পাতলে একটানা ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। পুবের দিকে তাকালে খানিকটা দূরে গিয়ে সবুজ মাঠ শেষ—জল শুরু। পুনর্ভবা আর খাড়িগুলো বুক ভরে জল নিয়ে চলেছে। তবে উপচে পরে নি। পশ্চিমে যতদূরে তাকাও, সবুজ আর সবুজ! মাখামাখি। এই সবুজ রংটার একটা নেশা আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় এই ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ধানগাছগুলোর উদ্ধত বেড়ে ওঠা, হাওয়ায় দোল খাওয়া। সারা ক্ষেতের ওপর দিয়ে যেন ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

দু-তিনদিন ধরে একটু জ্বর হচ্ছে অশোকের। কাল রাত্তে বোধ হয়

একটু বেশীই হয়েছিল। অহর বেশ সাবধানী—কী সব কয়েকটা ট্যাবলেটও দিয়ে দিয়েছিল। বর্ষাকাল তো, যদি জ্বরজ্বালা বা পেটের গণ্ডগোল হয়? তা সেগুলো পঙ্কুদার ওখানেই পড়ে আছে। থাকগে, তেমন কিছু হবে না মনে হয়। বড্ড গা-হাত-পা ব্যথা করছে। একটু কড়া করে গরম এক কাপ চা খাওয়া যেত। ক্ষেত-মজুরের ঘরে চা! অরুণকে চিঠি লিখে ফেললে হয়। আশোক ঘরে ঢোকে। বাড়িতে কেউ নেই। কেউ বলতে অবশ্য কালা আর কালার বৌ। দুজনেই কাজে গেছে। ঝোলা থেকে কাগজ আর কলম নিয়ে বারান্দায় বসে অশোক।

'প্রিয় অরুণ,

তোর চিঠি পেয়েছি অনেক দিন আগে। উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। তোদের সবার কথা খুব মনে পড়ে।'

কী লিখবে? অরুণকে অশোক ভালবাসে। কলেজের দিনগুলো অরুণকে বাদ দিয়ে ভাবতেই পারে না। ওরা দুজনেই ৬৫-তে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে। একই পাড়ার ছেলে। কলেজে গিয়ে বন্ধুত্বটা দানা বাঁধল। অরুণ সায়েন্সে, আর ও আর্টসে। অরুণের বাবা বার্ন কোম্পানির কেরাণী ছিলেন। অরুণ যখন থার্ড ইয়ারে, তখন বাবা মারা গেলেন। ছোট দুটো ভাই বোন আর মা—সংসার অরুণের কাঁধে। বার্ন কোম্পানীই দয়া করে চাকরি দিল অরুণকে। অশোক যেদিন গ্রামে রওনা হচ্ছে, অরুণ তুলে দিতে এসেছিল। সেদিনের অরুণের কথাগুলো মনে আছে অশোকের।—আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম সব ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। পারলাম না রে। তিনটে অসহায় মানুষ ভেসে যাবে। যেটুকু পারবো, করবো। তোরা এগিয়ে যা। ঘাঁটি-এলাকা গড়ে তোল। যেদিন ডাকবি, মা-বোনেদের হাত ধরে চলে যাবো। দেখিস, একদিনও দেরী করবো না। ও ওর মা বোনকেও তৈরী করছে সেভাবে। ন'টা-ছটা অফিস করে এখন হয়ত আর বিশেষ কিছু করতে পারে না। পৃথিবীর ঘটনাস্রোতের এমন চমৎকার বিশ্লেষণ ও আর কারুর কাছে শোনে নি। অরুণ যদি শুধু কলমটুকুও ধরে তো কিছু কাজ হবে। অশোকের রাজনৈতিক জ্ঞানের হাতেখড়িই অরুণের কাছে।

'ক'দিন ধরে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। একটু জ্বর জ্বর হচ্ছে। বৃষ্টিতে ক'দিন ভিজতে হয়েছিল, তারই ফল আর কি। (বাড়িতে আবার খবরটা

পৌঁছে দিস না।) মানিযে নিতে পেবেছি বলেই মনে হচ্ছে। উৎপাদনেব কাজে যুক্ত হওয়ার চেষ্টার অভিজ্ঞতাব কথা বলি। একদিন পাটক্ষেতে নিডানি দিতে গিয়েছিলাম। ঘাস তুলতে গিয়ে গোটা চারেক পাট-গাছ সঙ্গে তোলাব পব থেমে গেলাম। আমাদেবই এক মধ্য-কৃষক সমর্থকেব জমি, তাই বক্ষে। আব বিশ্বাস কব, মোটামুটি নৌকো চালাতে শিখেছি। দুটো কবিতা লিখেছি। অনেক মানুষ দেখেছি। একদম আসল মানুষ—যাবা দুঃখ হলে হাউ হাউ কবে কাঁদে। বাগলে টেবিলে থাপ্পড় মাবে না, যাব ওপবে বাগ, তাকেই ঠ্যাঙায়। এই ক'টা মাসে এত নতুন অভিজ্ঞতা হল যে, ঠিক তোকে লিখে বোঝাতে পাববো না। অনেক কিছু নিযে ভাবতেও শিখেছি। ক'দিন ধবে একটা চিন্তা খুব মাথায় ঘুবছে। তোকে না লিখে পাবছি না।'

মাথাটা বড ঝিমঝিম কবছে। অশোক পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বাব কবে। পূর্ণর মোডেব আড্ডাটাব কথা মনে পডছে। তখন ফার্স্ট ইযাবে। কলেজে উঠে পাখা-গজানোব সমযটা। নতুন সিগাবেট ধবেছে। প্রেমের কবিতা লেখাব চেষ্টায় খাতাব পাতা নষ্ট কবেছে। নিজেদেব তখন বিরাট ইনটেলেকচুয়াল ভাবতো। সাঁত্রে, কাফকা, কামু বই থাকতো হাতে হাতে। সাহিত্য-পত্রিকা বার কবাব চেষ্টা কবত। নাঃ, বিড়ি খেতেও ভাল লাগছে না। জ্বরটা বোধ হয় বাডছে। চিঠিতে মন দেবাব চেষ্টা করে।

'আমাব মনে হচ্ছে, আমবা ভাবতবর্ষেব মানুষের ভাষাটাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা কবছি না। চীনেব জাতীয় সংস্কৃতিব বিকাশের ধাবা অনুযায়ী ওখানকাব সাহিত্যে বা রাজনৈতিক প্রবন্ধে যে ধবণেব উপমা ব্যবহৃত হযেছে, এখানে তা চালাতে গেলে মানুষেব কাছাকাছি পৌঁছোতে বোধ হয অসুবিধে হবে। কৃষকদেব কাছে আমাদেব পার্টি-পত্রিকা পডে শোনাতে গিযে এ-অসুবিধেটা উপলব্ধি কবছি। উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অঞ্চলের কৃষকদেব কথা বলাব দিকে নজর না দিলে ওদেব বোঝায় ঘাটতি থেকে যাবে। যেমন ধব, আমরা বলি বাঘ আব মানুষে এক সঙ্গে বাস কবতে পারে না। বাঘকে বাঁচতে গেলে মানুষ খেতে হবে, আর মানুষকে যদি বাঁচতে হয় বাঘকে মারতে হবে। শ্রেণীশত্রুকে বাঘ হিসেবে হামেশাই চিত্রিত করে থাকি। কিন্তু যে-অঞ্চলে জঙ্গলের ছায়া-মাত্র নেই সেখানে শেষ বাঘ দেখেছিল হয়ত দু'পুরুষ আগে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় এ-উপমার আকাঙ্ক্ষিত ফল হচ্ছে না। পাশাপাশি এদের নিজেদের কথা শোন। দুই ভাই-ই প্রচণ্ড অত্যাচারী মহাজন বোঝাতে বলছে,

এক গর্তে দুটো সাপ। সাপ অনেক প্রত্যক্ষ এদের কাছে। 'শোষণের চার পাহাড়' বা 'বোকা বুড়োর পাহাড় সরানো'তে পাহাড় যে-অর্থে এসেছে ; আমার মনে হচ্ছে, এ-এলাকার কৃষক-জনগণ তা নিতে পারছে না। চীনের ভূপৃষ্ঠ মূলতঃ পাহাড়ী। পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করেই মানুষকে ফসল ফলাতে হয়। তাই পাহাড় তাদের কাছে দুষমণ। ভারতের বিস্তীর্ণ সমতলে পাহাড় দেখেছে এমন চাষীর সংখ্যা নগণ্য। দূর থেকে কালো ঢিবির মত গঙ্গাপারে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ও বড় জোর দু'চারজন দেখেছে। আরেকটা কথাও মনে রাখিস, শহরের মানুষ প্রত্যক্ষ না দেখলেও বইয়ে পড়ে বা ছবি দেখে পাহাড় বা অন্য অনেক কিছু সম্বন্ধে যে-ধারণা রাখে বা চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখে থাকে, এদের ক্ষেত্রে সেসব একদম অনুপস্থিত। বোকা বুড়োর পাহাড় কেটে একটু একটু করে জয়ের দিকে এগোনো, ধৈর্য না হারিয়ে লেগে থেকে দুষমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা তাই এদের উপলব্ধিতে কতটা আসছে, আমি বুঝতে পারছি না। বড় জোর পাহাড় একটা ভারি বোঝা বিশেষ, তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলতে হবে, বোধ হয় এ-ধরণের চিন্তাই তৈরি হচ্ছে।

আরেকটা কথাও মনে হচ্ছে এ-প্রসঙ্গে—ভারতীয় সাহিত্যে (আমার যেটুকু পড়া আছে) পাহাড় বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবেই বোধ হয় ব্যবহৃত হয়েছে। চারিদিকে সমতল মাঝে মাঝে পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সুকান্তর আহ্বান মনে কর—'মাথা তোল বিন্ধ্যাচল / ছেঁড়ো আকাশের উঁচু ত্রিপল।'

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা লাগছে অশোকের। ঘরে ঢুকে ঝোলা থেকে শহরে পরে যাবার শার্টটা নেয়। আজব দেখাচ্ছে ওকে। ঘিয়ে রঙের বুক কাটা হাফ শার্টের নীচ দিয়ে নীল রঙের ফুলহাতা শার্ট বেরিয়ে আছে। অরুণ এমন চিঠি পেয়ে ভাববে না তো, আবার গ্রামের কর্মীরা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছে! অন্য কাজ ফেলে রেখে তো আর তা নিয়ে ভাবতে বসছে না। এ-পর্যন্ত অবশ্য সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লব ব্যাপারটা শ্লোগানের পর্যায়েই আছে। কৃষকদের সংগঠিত করছে। তারপর ঘাঁটি-এলাকা তো পরের কথা, আগামী ফসল তোলার লড়াইও কী চেহারা নেবে, ও ভাবতে পারে না।

'তুই ভাবিস না সব ছেড়ে ভাষা-তত্ত্ব নিয়ে পড়েছি। সবদিক নিয়ে কাজের দিকে ভাবার চেষ্টা করছি। তুই-ই একদিন বলেছিলি, মনে আছে—চেয়ারম্যান

মাওয়ের ইয়াংসি নদী সাঁতারে পার হওয়ার ঘটনা পিকিং রেডিও এত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছে কেন? তখন ঠিক কথাগুলো উপলব্ধি করি নি। আজ বুঝছি চীনের ইয়াংসি, হোয়াংহো বিধ্বংসী নদী। মানুষের সৃষ্টিকে খড়কুটোর মত ধুয়ে নিয়ে যেত। নয়া-গণতান্ত্রিক চীনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মানুষ জয়লাভ করেছে, তারই প্রতীক হচ্ছে সাঁতরে ইয়াংসি পার হওয়া। অথচ আমাদের দেশে দেখ, ধ্বংস করে যে নদীগুলো তারা নদ—ব্রহ্মপুত্র, দামোদর। নারী হচ্ছে সৃষ্টিকর্ত্রী—তাই আমাদের দেশে বেশীর ভাগই নদী। নদী মাতৃরূপিনী যে দেশে, সে দেশে নদীকে শত্রু হিসেবে দেখানো চলে না। ভাব একবার, পদ্মাকে কীর্তিনাশা বলেছে কিন্তু সর্বনাশী বলে নি।

বড় শরীর খারাপ করছে রে। তোকে যে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমাদের মত মধ্যবিত্তকে দিয়ে কতদূর কী হবে জানি না! বুদ্ধি দিয়ে, আবেগ দিয়ে বিপ্লব করতে এসেছি। শ্রেণীসংগ্রাম, উৎপাদনের জন্য সংগ্রামের তেমন অভিজ্ঞতা নেই। মাঝে মাঝে নিজের ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস জন্মায়। আবার ক'দিন বাদেই দুর্বল মনে হয়। একদিন-দু'দিন উপোসেই পালাতে ইচ্ছে হয়। কলকাতার খবর কী রে? কলকাতাকে ভুলতে চেষ্টা করছি। পারছি না। স্বদেশ বস্তির কাজে যাচ্ছে? আমার বাড়িতে যাস মাঝে মাঝে। মা'র কথা প্রায়ই মনে হয়। কলকাতা যেতে ইচ্ছে করছে এখানকার কমরেডদের বলতে ভরসা হচ্ছে না। শহরমুখী প্রবণতা দূর করা উচিত। কবে যে তোদের সঙ্গে দেখা হবে। শেষ করছি। চিঠি দিস। অনেক অনেক ভালবাসা নিস।

গৌতম'

কাগজ-কলম ঝোলায় ঢুকিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে চট পেতে শুয়ে পড়ে অশোক। মাথা খাড়া করে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ক'টা হবে? কালাদের আসার সময় হয়ে এল বোধ হয়। সেই সকালে গামছায় ভাত আর শাক বেঁধে কালা আর ময়না পাইট খাটতে গেছে মহাজন হপন মুরমুর ক্ষেতে। হপন মুরমু এ-অঞ্চলের বড় মহাজন। পাঁচ গ্রামের প্রধান। জাতে সাঁওতাল, একটু বিদ্যে আছে পেটে, লিখতে পড়তে পারে। আর আছে লোকঠকানোর বুদ্ধি—সহজ সরল সাঁওতালদের মধ্যে তীব্র ব্যতিক্রম। অশোকের ভাত হাঁড়িতে রেখে গিয়েছিল। সূর্য মাঝ আকাশে যাওয়ার আগেই বসন্তের দাগের মত

কালো দাগ ধরা ভারি অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ভাত বেড়ে খেয়েছে। গুটি-সুটি হয়ে শুয়ে পড়েছে অশোক, শীতকাতুরে বাচ্চাছেলের মত। অল্প ঘুম আসে অবসন্ন অসুস্থ শরীরে। মা'র মুখ যেন বহু দূর থেকে স্রোতে ভেসে আসতে চেষ্টা করে।

—কমরেড ও কমরেড।

কালা আস্তে আস্তে নাড়া দেয়। দিনশেষের পশ্চিম আকাশের মত লাল চোখে তাকায় অশোক। বোকা বোবা চাউনি।

—শরীল খারাপ করে নাকি?

—আঁ।

গোঁঙানির মত শব্দ। কালা বোঝে অশোকের জ্বর বেড়েছে। গা-টাও বেশ গরম। ময়না এতক্ষণ একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। কালা উঠে ময়নার কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে বলে—রাইতে কমরেডের লেগে রাঁধন লাগব না।

ময়না ঘরের কোণ থেকে মাটির পোড়া কালো হাঁড়িটা তুলে নেয়।—উবেলাকারটাও পুরা খায় নাই!

দিনভর খাটনের পরও কালা-ময়নায় হাসতে হাসতে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু এখন কালা বিরক্ত হয়। বিরক্তি যেন ময়নার ওপর, বিরক্তি নিজের দুর্বলতার ওপর। কোন দেশের ছেলে ওর কমরেড কে জানে। ঘরদোর ফেলে ওদেরই জন্য এসে পড়ে আছে। আর কালার একটা কাজ করতে কিনা সাত-পাঁচ ভাবনা?

—ময়না রে তুই আমারে ধরি রাখস না। ঘর না ছাইড়লে কাম আগু বাড়ান যায় না।

ময়না ওকে ঘরে ধরে রাখতে চায় না। ময়না চায় কালার সঙ্গে থাকতে। কালা যদি ঘর ছাড়ে তো ওর কিসের ঘর! ও ওতো পার্টির কাজ একটু একটু বোঝে। কমরেড যেদিন যেদিন রাতে থাকে ওদের ওখানে, কুপিটা কাছে টেনে লাল বই খুলে পড়ে, কালার সাথে একপাশে চুপ করে বসে ময়নাও শোনে। কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। সারাদিন খাটুনির পর পেটে ভাত পড়ে, ওর ঘুম পেয়ে যায়। কালার যে কাজ করার কথাই ঠিক হোক না কেন ময়নার এক কথা—আমি যাবে তুর সঙ্গে। কালা রেগে যায়—মেয়াছেলায় সব কাম পারে?

ময়না থালায় সযত্নে দিনের ভাত ক'টা তুলে রাখে। পাটখড়ি ও লকড়ি দিয়ে উনোন ধরিয়ে হাঁড়িতে জল চাপায়। বারান্দারই একপাশে রান্নার ব্যবস্থা। আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে ময়না। সারাদিন খেটে মাগমরদে দুটো টাকা পেয়েছে। হপন মহাজন বুড়া মিন্‌ষা। সেই যে ওরা ধার নিয়েছিল ক'টা টাকা—ঠিক কাটছে। কত টাকার কত সুদ, আর কত কাটছে—অত বোঝে না ময়না। শুধু দেখে, এখন জন খাটছে, সব মরদেরা সাত সিকা আর মেয়ে পাঁচ সিকা। ওরা পাচ্ছে সেখানে পাঁচ সিকা আর তিন সিকা। মরণও হয় না বুড়া হপনার, আগুনে আরো দুটো খড়ি ঠেলে উসকে দেয় ময়না।

১৫

জহর আর রবীন কলকাতা থেকে ফিরেছে। ট্রেন লেট। এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা, প্রায় একটা বাজছে। দু'জনে থার্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমে এসে দাঁড়ায়। চা খেতে খেতে দু'জনে সারা ঘরটায় চোখ বোলায়। কোথাও একটু জায়গা খালি নেই। এত রাতে কারুর বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি করা উচিত হবে না। পেচ্ছাবখানার রাস্তার ধারে লুঙ্গি বার করে পেতে নেয়। বসে সিগারেট ধরায়। রবীন হাই তোলে।

—ক'দিন হল রে ?

—কিসের ?

—এই কর্মক্ষেত্রে ফিরলাম ক'দিন বাদে ?

—পাঁচদিন।

রবীনের আরেকটা হাই ওঠে।

—সকালের প্যাসেঞ্জারে এলেই হত। ফালতু রাত জাগা।

—ভাল লাগে নারে কলকাতায়। জহর মেঝেতে চেপে ধরে সিগারেট নেভায়। রবীন শুয়ে পড়েছে। জহর চারপাশের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে দেখতে থাকে। মাথায় মিটিং-এর কথাই ঘুরছে। গ্রামাঞ্চলে গেরিলা অ্যাকশন সংগঠিত করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিপ্লবী কৃষক-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এদ্দিন হুনান আর তরাই রিপোর্ট মাথায় নিয়ে যেভাবে কাজ করছিল, তা পুরোপুরি বদলে যাবে। সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান, জঙ্গী অর্থনৈতিক আন্দোলনের

চিন্তার জায়গায় একটা কর্মসূচী পাওয়া গেল। জহর বুঝতে পারছে না লড়াই আরম্ভ করার আশু কর্মসূচী সামনে, কিন্তু তার প্রস্তুতি কতটুকু? শুনান রিপোর্টে তো পড়েছে—কৃষকেরা তাদের ব্যাপক সংগঠনের শক্তির ওপর নির্ভর করে অ্যাকশনে নেমেছিল। কৃষক-সমিতিগুলো সাফল্যের সঙ্গে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছিল। জহরের দ্বিধা, ওদের এখানে কৃষক-সমিতি গড়েই ওঠে নি, আর সংগঠনের শক্তি কতটুকু! শ্রীকাকুলামের অবস্থা জানে না, নিশ্চয়ই সংগঠন খুব জোরদার, যার এই শ্রেণীশত্রু খতম ওদেরই অভিজ্ঞতা-প্রসূত। মেদিনীপুরে ভাল কাজ হয়েছে। ওখানকার কমরেডরাও অত্যন্ত উৎসাহিত এ-লাইন সম্পর্কে। জহরের হঠাৎ মনে হয় লড়াই ঘাড়ের ওপর তাই নিজের ভেতরের ভয়ভীতিই দ্বিধার জন্ম দিচ্ছে না তো? জহরের মনে পড়ে, ছেষট্টির খাদ্য-আন্দোলনে হাজারো মানুষের মিছিলের সামনে পুলিশ রাইফেল তাক করে দাঁড়ালেও ও তো ভয় পায় নি। হয়ত ঘৃণার ও ক্রোধের গান্ধীবাদী প্রকাশ ছিল, কিন্তু জামার বোতাম খুলে কী বলে নি—মারো কত গুলি আছে। প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের দিন পুলিশের লাঠি খেয়েছে, গুলিও চলেছিল। কই কোথাও মনে ছিটেফোঁটা ভয়ডরও তো কাজ করে নি।

সামনে একটা বাদিয়া মুসলমান পরিবার। ঘুমের ঘোরে বাচ্চাটা সরতে সরতে অনেক দূর চলে গেছে। মায়ের হুঁশ নেই। জহর লোকজনের গা বাঁচিয়ে পা'টা একটু ছড়িয়ে বসতে চেষ্টা করে। এত লোক কেন? এখন তো মাটি কাটতে যাবার সময় নয়। সামনে ধান কাটার দিন আসছে। মালদার বাদিয়া মুসলমানদের মাটি-কাটার কাজে খুব সুনাম আছে। উড়িষ্যার লোকদের পরই। চৈত্রের শেষে বেরিয়ে যায় এরা নেপাল আসাম আর উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলোতে। বাষট্টি সালের পর থেকে মিলিটারি তত্ত্বাবধানে এইসব দিকে অনেক রাস্তা তৈরি হচ্ছে। দু'মাস তিন-মাস একটানা খেটে ঘরে ফেরে। কনট্রাক্টর তাদের দালাল আর মোড়লদের দিয়ে যা থাকে, তাতে খাটনি পোষায় না। তবু ফি বছর যায়। না গিয়ে উপায় কী? ঘরে তো বসে খেতে হবে। যা দু পয়সা আসে। রবীনের বুকপকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সিগারেট ধরায় জহর।

স্টেশনে রাত কাটানো ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু এবার ফেরার দিন আগে থেকে ঠিক ছিল না। তাই কাউকে বলে রাখা হয় নি। কারুর বাড়ি গিয়ে পাড়া

মাথায় করে ডেকে জাগাতে হবে। সেটাও উচিত না। এখনও চলাফেরায় অনেক শিথিলতা আছে। এরপর আর চলবে না।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। বেশ বড় বড় ফোঁটা পড়ছে মনে হয়। হৈ হৈ করে কয়েকজন রিক্সাওয়ালা ছুটে আসে স্টেশনের ছাদের নীচে। রাতের আর ভোরের গাড়ির যাত্রীদের জন্য ওরা রাতটা রিক্সাতেই ঘুমিয়ে কাটায়। হঠাৎ বৃষ্টির শব্দে আর বৃষ্টি-ভেজা হাওয়ার দাপটে দু'চারজন উঠে বসে। চারদিকের সামান্য ব্যস্ততাটুকু মিইয়ে আসে। বৃষ্টি চলতে থাকে। বিড়ি পোড়ে এর ওর মুখে। এত লোক, অথচ কোন সাড়াশব্দ নেই। ভীড়ের নিস্তব্ধতা ভাল লাগে না জহরের, অনেকদিন বাদে কলকাতা গিয়েছিল। বাড়িতে ছিল একদিন। এক বিরক্তিকর স্মৃতি। বাড়িতে আর যেতে ইচ্ছে করে না। বাবা লোকটাকে তবু সহ্য করা যায়। সহজ—পরিষ্কার স্বীকার করে, বৃটিশ আমলে তাদের গোলামি করেছি, এখন এদের। তোমাদের বক্তব্য আমি বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। তোমরা যে যা ভাল বোঝ, কর। বাড়ির বাকি লোকগুলো— মা, ভাইয়েরা, বোনেরা প্রচণ্ড স্বার্থপর, ভোগবাদী, ওপরে ওঠার স্বপ্ন আর অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা। জহরকে সহ্য করতে পারে না। কারণ জহর ভাল ছেলে, ভাল চাকরি করে, অনেক টাকা বাড়িতে এনে দেবে,—আশার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে কী কুক্ষণে ভাল নম্বর পেয়েছিল! রাজনৈতিক কাজে স্বার্থকতা খুঁজে পেয়ে অনার্সে নম্বর খারাপ হল। কী করবে এরপর— নানান উপদেশ। সাতষট্টিতে ভোটে প্রচুর খেটেছিল। তারপর আর কী করবে বিশেষ ভাবতে হয় নি। নকশালবাড়ির কৃষক-বিদ্রোহ—ভারতের আকাশে চৈতালী ঝড়ের ঘূর্ণিবার্তা। কৃষকদের কাছাকাছি থাকবে সংকল্প করেই এই মালদার খরবা থানার কহুয়া স্কুলে ফিজিক্সের শিক্ষক হিসেবে চলে এল।

একটু ঝিমুনি আসে জহরের। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। রবীন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। জহর সঙ্গে থাকলে সবাই কেমন যেন নিশ্চিন্ত থাকে, সব ভাবনার দায়িত্ব যেন জহরের। হঠাৎ ট্রেন আসার আগের ঘণ্টাটা বেজে ওঠে—ট্যাং ট্যাং ট্যাং একটানা। তন্দ্রা ছুটে যায় জহরের। রবীনের হাতের কব্জিতে ঘড়ি *টিক্‌টিক্* করছে পৌনে চারটে। জেগে উঠেছে আরও অনেকে। দু'একজন সদ্য ঘুমভাঙ্গা বিস্ময়ের চোখে এদিক ওদিক দেখছে। দু'চারটে বাচ্চা কান্না জুড়ে দিয়েছে। জহর চায়ের দোকানের দিকে এগোয়।

—এক কাপ চা দেখি ভাই।

রবীনটা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। চা'টা খেতে ভাল লাগছে। প্রথম শ্রেণীর কাউণ্টারে সপরিবারে একজন মোটা মত ভদ্রলোক টিকিট কাটছে। মেয়েটির প্রতিটি ভঙ্গিতে একটা স্মার্টনেস আছে। একটা পরিচ্ছন্ন ঔজ্জ্বল্য। সুস্মিতা নিশ্চয়েই এতদিন কানাডা চলে গেছে। দুর্বলতা ছিল মেয়েটার ওপর। তাই হয়তএককালে ততটা সময় দিয়েছিল ওকে তৈরি করতে। কেরিয়ার নষ্ট করে রাজনীতি করার মত বোকামি করতে রাজী হয় নি সুস্মিতা। এম. এস. সি-তেও প্রথম শ্রেণী। দুপাঁচ টাকা চাঁদা দিতে আপত্তি করে নি, আর বার বার জহরকে বোঝাতে চেয়েছে—নিজের কথা একটু ভাবো। দূরে সরে গিয়েছে জহর—দু'জনের পথ আলাদা। তবু মনের কোথায় যেন এক টুকরো ব্যথা আজও লুকিয়ে আছে, নইলে মাঝে মাঝে মনে পড়ে কেন!

একটা ট্রেন প্ল্যাটফরমে ঢোকে। সারা স্টেশনবাড়িটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। রবীনের ঘুম ভেঙ্গেছে।

—এই জহর, একটা সিগারেট দেতো।

চারদিক ফর্সা হতে শুরু করেছে। স্টেশনের চড়া নিওন আলোয় বোঝা যাচ্ছে না। জহর রবীনকে জিজ্ঞেস করে—রিক্সায় যাবি, না হেঁটে?

—রিক্সাতেই চল।

রিক্সায় যেতে যেতে রবীন জহরকে বলে—মিটিং কবে ডাকছিস? পয়লা সেপ্টেম্বর তো ঠিক হয়ে আছে।

—অত দেরী করবি?

—আর তো মোটে সাতদিন। আগে করতে চাইলেও সবাইকে খবর দিতেই তো দিন দু'তিনেক লেগে যাবে।

—এটা কী জেলা কমিটি, না এক্সটেনডেড?

—তুই কী বলিস? আমার তো মনে হয় সবাইকে নিয়েই বসা উচিত। এত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কে সবার মতামত নেওয়া উচিত।

—অশোক ছেলেটাকে দিয়ে কদ্দূর হবে মনে হচ্ছে?

রবীনের এই এক দোষ। সবসময় ওপরওয়ালা ভাব।

—এগোবে। ভাল ছেলে।

জহরের মনে হয় অশোক একটু ভাববাদী। মাটি ছেড়ে আকাশে ঘুরে বেড়ানো আবেগ, বাস্তবের ধাক্কা কম খেয়েছে তো। ভাবের আকাশের

মেঘগুলো হালকা হয়। তবু বেশ লাগে অশোককে। রবীন বড় যান্ত্রিক। জহরের হঠাৎ প্রশ্ন জাগে—হ্যাঁ রে রবীন, আমাদের এখানে স্কোয়াড সত্যি করা যাবে?

—তোর এলাকায় তো এ্যদ্দিন ধরে কাজ হচ্ছে। হবে না?

—আমি তোর এলাকার কথা জিজ্ঞেস করছি।

জহর আর রবীন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে গ্রামে বসেছে প্রায় একই সঙ্গে, তবে মাস কয়েক শিক্ষকতা করার সময় এ-জেলাতে সংগঠন গড়ার কাজটা জহরই শুরু করেছে। এ-জেলাই বোধ হয় একমাত্র জেলা, যেখানে পুরোনো পার্টি ভেঙ্গে কেউ বেরিয়ে আসে নি।

আমার ওদিকে তাড়াতাড়ি আরও দু'জন হোল টাইমারের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে গুছিয়ে আনতে পারবো না। খতম দু'একটা করিয়ে দেবো।

দুজনেরই খেয়াল হয়, রাস্তায় আর এ-আলোচনা নয়। জহর কার এলাকায় কীরকম কাজ হয়েছে, ভাবতে থাকে। গ্রামে সাকুল্যে আটজন হোল টাইমার। ও আর রবীন বছর দেড়েক ধরে আছে। বাকীরা সবাই গত ছ'মাস আটমাস। জহরের ধারণা, এত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন করতে কেউই রাজী হবে না। আরেকটু সময় হাতে নিয়ে সংগঠনকে প্রস্তুত করে কিছুদিন বাদে করা যাবে বলে মনে হয়।

রিক্সা দু'নম্বর কলোনিতে ঢোকে। রবীন জিজ্ঞেস করে—নরেশের বাড়ি যাবি?

—হ্যাঁ, ফিরেছি, এ-খবরটা দিয়ে যাই।

—এলাকায় কবে যাচ্ছিস?

—আজই চলে যাবো।

জলে-ভেজা পিচের রাস্তার ওপর রিক্সার চাকার শব্দ এগোতে থাকে। ট্রেনে আসতে শোনা একজন ভিখিরির গানের করুণ আকুতি জহরের কানে বাজতে থাকে—

ভবের হাটে জনম দুখী আমি একজনা,
এ ভবে এসে শুধু দুঃখু পেলাম
সুখের আশা দেখি না.........

১৬

সান্টিবাড়ি গ্রামটার পাশেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা পীচ রাস্তায় মিলেছে। গাড়িটা দাঁড়ায়। দাঁড়াতে পেরে বলদ দুটো চোখ বন্ধ করে জাবর কাটতে থাকে। অশোক এতক্ষণ কালার পিঠে হেলান দিয়ে বসে ছিল। ডান হাত দিয়ে গাড়ির কাঠামোর একটা বাঁশ ধরে।

—নেইমে যা কালা। ফুর্তি করে যেইতে হবে। দেরি করলে বাবু ফের গাল পাড়বে।

কালা নেমে হাত ধরে আশোককে নামায়। হেঁটেই রওনা হয়েছিল ওরা। অশোকের জ্বরটা আজ একটু কম মনে হচ্ছে। গত ক'দিন ধরে যে কীভাবে কেটেছে! বড় দুর্বল লাগছে। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ওর ঝোলাটা কালার কাঁধে। হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো ধরে যাচ্ছিল। বর্ষাশেষের চড়া রোদ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কালা বুঝতে পারে, অশোক আর হাঁটতে পারছে না।

—কমরেড একটুকুন বইস ই ছায়াতে।

রাস্তার ধারে পাকুড় গাছের ছায়ায় বসেছিল অশোক। কালা বলে—কেন পুকুরের হাট আইজ। ইদিকের দু-চারটা গাড়ি যায়। কাছেই ডান হাতে জিসারৎটোলা গ্রামটা। কালা পা বাড়ায়। ছায়ায় ভাল লাগছে। আবার মাঝে মাঝে একটু শীত শীতও করছে। বড় তেজ রোদের। কালাটা দেরী করছে কেন? বেচারার আজ কাজে যাওয়া হল না। অশোকের নিজেকে অপরাধী লাগে। কী যে একটা শরীর হয়েছে। কালা হাঁপাতে হাঁপাতে আসে, মুখে জয়ের হাসি।

—উঠ কমরেড, গাড়ি মিলে গেছে। এক কোরোশ রাস্তা।

এক ক্রোশই বটে। কত মাইলে যে এদের ক্রোশ হয়। এখান থেকে পীচ রাস্তা কম করেও চার মাইল। গাড়িটা পাশের নীচু রাস্তা থেকে বোর্ডের রাস্তার ওপর উঠে আসে।—আয় হো কালা জলদি।

ওরা উঠে পড়ে। মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, চারিদিকে যেন বড় বেশী আলো। কাল রাতে মিটিং আছে। জহর আর রবীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মিটিং করে ফিরেছে নিশ্চয়ই। চারিদিকে যেন বড় বেশী আলো। বর্ষা-

শেষের মাটির রাস্তা—প্রচণ্ড এবড়ো খেবড়ো। গাড়িটার প্রত্যেকটা ঝাঁকুনি মাথায় গিয়ে লাগছে। উঃ, এত রোদ কেন! সারা শরীরের চামড়া যেন জ্বলছে। জ্বর আবার বাড়ছে না রোদে গরম লাগছে! চারপাশে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

কালা বোঝে রোদ সহ্য কবতে পারছে না অশোক। কোমরে পেঁচিয়ে জড়ানো গামছাটা খুলে অশোকেব মুখ-মাথা ঢেকে দেয়। বসে থাকতে পারছে না। কালা নিজের কোলেব ওপর অশোকেব মাথা নিয়ে কপালে হাত রাখে। অশোকের ভাল লাগে, কিন্তু গাডিটা এত লাফাচ্ছে। প্রতিটি ঝাঁকুনিতে পিঠে লাগছে। একটু পরেই উঠে বসে অশোক। ধীরে ধীবে কালার পিঠে হেলান দিয়ে নিজের অনেকটা ওজন কালার ওপব ছেড়ে দেয়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আধো ঘুম অবস্থায় গাডোয়ান আব কালার কথাবার্তা ছাডা ছাডা কানে আসে।

—পার্টির লোক।

—কাস্তে-হাতুডি কী ধানের শীষ?

—না, ভোটের পার্টি নয়।

—তো ফের কুন পার্টি?

—ই হইছে রাজ বদলাইবার পার্টি।

—ক'দিন বাদে দেখবি ভোটে খাড়া হয়ে গিছে।

—হঁ, তুই সব বুঝিস। ভোটের বাবুবা ভোটের সময় ছাড়া ছিরি মুখ দেখান? জল নাই, ঝড় নাই, খাওয়া নাই অসুখ-বিসুখ সব লিয়ে আমাদের ঘরে এমনি থাকবে উরা? আমাদের সুখ-দুখে? তবে তো শালা সে-পার্টিকে ভোট দিলেও লোকগুলান আমাদের দুঃখু বুঝবে।

—ই কথাডা বুলেছিস ভাল। তা তুই শালা করবি টা কী?

—কেন একাট্টা কববো মানষে। জমির লডাই, ফসলের লড়াই করবো, পার্টি বানাবো।

বিড বিড করে অশোক বলে—রাজের লড়াই। অশোক কি বলে, কালারা খেয়াল করে না। পিচ রাস্তা এসে গেছে।

গাড়িটা ওদের নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। কালা অশোককে বলে—মোটরের দের আছে মনে হয়। দু'জনাতে পথের শেষপ্রান্তের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

—শহুরে ওষুধ পথ্যি করে লিও।

—কাল। তুই জিসারৎ টোলায় বিরসাদের আর বসনা পঞ্চুদাদের খবর দিস। আর সরগাছিয়াতে নতুন যারা যোগাযোগ করছে, তাদের সঙ্গেও মিটিং করিস।

—উ সব করে দিব। কিছু ভেবো নাকো।

—বাসের আওয়াজ আসছে কী?

—মুনে হয়, হাঁ ঐ তো।

—ক'টা দিন ফিরতে দেরী হলে ভাবিস না।

—না উ ঠিক আছে। শরীলটারে ঠিক করি লাও।

* * *

অশোকের ঝিমুনি কেটে যায়। তাকিয়ে দেখে শহরের পশু হাসপাতালের পাশে বাস দাঁড়িয়ে। শেষ ক'জন যাত্রী নামছে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। কোথায় যাবে? মিনুদের বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে? শরীরটা ক'দিন ভোগাবে মনে হচ্ছে। আগামীকাল মিনুদের বাড়িতে যাওয়ার কথা। কদিন জ্বরে এত কাবু করেছে, ডাক্তার দেখানো উচিত কিনা সেটাও শহর-সংগঠনই বলে দেবে। নরেশের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করে সব ঠিক করাই ভাল। তারপর ও যা বলবে। হাঁটতে শুরু করে। খানিকটা হাঁটার পরেই টলে পড়ে যাবে মনে হয়। পারছে না আর হাঁটতে। একটা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়ায়। পাজামার পকেট হাতড়ে দেখে ষাট পয়সা আর চারটে বিড়ি আছে। সামনের মোড় থেকে নরেশের বাড়ি কত নেবে? ধার পায়ে এগিয়ে একটা রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে। পঞ্চাশ পয়সা নেবে শুনে আশ্বস্ত হয়।

ভর দুপুরে বাড়ির সামনে রিক্সার প্যাঁক প্যাঁক শুনে ভারতী জানলা দিয়ে উঁকি মারে। অশোক কড়া নেড়ে অপেক্ষা করে। ভারতী দরজা খুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

—নরেশ আছে?

—না, দাদা তো নেই।

—কখন ফিরবে?

—বিকেলের দিকে ফিরতে পারে, নাহলে একেবারে রাত্রে।

—আমি নরেশের বন্ধু। মানে এমন মুশকিলে পড়েছি।

ভারতী অশোকের চেহারা দেখেই বুঝেছে, নিজেদের লোক। বড় ক্লান্ত অশোক, তবে কী মিনুদের বাড়ি চলে যাবে? আবার এতটা পথ হাঁটা।

—আপনার কী শরীর খারাপ করছে ?

—হ্যাঁ, ক'দিন ধরে জ্বর হয়ে···

—ভেতরে আসুন, বাইরে রোদে নয়।

অশোককে নরেশের বিছানায় বসায়।

—আমাকে একটু জল দেবেন ?

ভারতী বেরিয়ে যায়। নরেশের বাড়িতে অশোক আগে একদিনই এসেছে, সেদিন মেয়েটিকে দেখে নি।

—আপনার খাওয়া হয়েছে কিছু ?

জলের গেলাসটা এগিয়ে দেয়।

—খেতে ইচ্ছে করছে না একদম।

ভারতী গিয়ে মাকে অশোকের জ্বর ও না-খাওয়ার কথা বলতেই ভারতীর মা সাত তাড়াতাড়ি করে উঠে দুধ গরম করে এক গ্লাস ভারতীর হাতে দেন। অশোক ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। ওর নিজের বোন ছোটনের কথা মনে পড়ে, বারো তেরো বয়েস হল—পারলে এখনও পুতুল খেলতে বসে।

—ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

—না। ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে অশোক।

নিঃসঙ্কোচে ভারতীর দিকে তাকায়। জ্বর না বাড়লে বিকেলে মিনুদের বাড়ি চলে যাবে।

—এভাবে জ্বালানোর কোন···

—সে পরে ভাববেন। দুধটা খেয়ে এখন শুয়ে থাকুন।

—নরেশকে একটা খবর—

—সে হবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

ভারতী একটা বিছানার চাদর অশোকের পায়ের কাছে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যায়। অশোকের শরীরটা কেমন যেন ছেড়ে দিয়েছে। গা-হাত-পায়ে ব্যথা, মুখ বিস্বাদ, এখন আর ডান কানটাও যেন ব্যথা করছে। বিড়ি ধরায় অশোক। টান দিয়ে বিড়ির মুখটা গনগনে লাল করে নেয়। তারপর কানের ফুটোর কাছে ধরে। তাপটুকুতে আরাম পায়। বার কয়েক এমন সেঁক দেবার পর ঘুম পায়। শুয়ে পড়ে অশোক।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। চপলাবাবু বাড়ি ফিরলেন। অফিসের অভ্যেস এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। গত বছর রিটায়ার করেছেন। দুপুরে

ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। খেয়েদেয়েই ব্রীজ খেলতে ছোটেন। বেশ জমিদারী গলায় ডাকেন—খোকার মা।

ভারতীর মা চায়ের জল বসিয়ে রাতের তরকারী কুটছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।—কী বলছ ?

—চা'টা দেবে নাকি ? খোকা ফেরে নি ? ব্যাংক কী আজকাল রাতেও খোলা থাকে ?

ভারতীর মা'র বিরক্তি লাগে। খোকা যেন সেই ছোট্টটিই আছে। উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

—তোমার ছোট পুত্র আজ বড় বাড়িতে ?

—না ও নয়, নরুর বন্ধু ও ঘরে। জ্বরে ছেলেটার গা পুড়ে যাচ্ছে।

—কে বন্ধু ? জ্বর তো এখানে কেন ? রাজ্যের উৎপাত কী এ-বাড়িতেই জড়ো হবে ?

—আঃ, কী হয়েছে তোমার! একটা অসুস্থ ছেলে, বাপ-মা ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁয়ে। গাঁয়ে নরুদের পার্টি বানায়।

—তা এ-বাড়িটা কি পার্টির অফিস নাকি ?

—তোমার যত। কত বড় ঘরের ছেলে জানো! সব ভাল ভাল ছেলে। এর তো বাড়ি কলকাতায়, ভারতী বলছিল।

—ডাক্তার দেখানো হয়েছে ?

—না খোকা এলে। যেন দোষটা নিজেরই, এমন মুখ করে তাকাল ভারতীর মা।

—ভারতী কোথায় ?

—এই একটু আগে নরেশের খোঁজে বেরিয়েছে।

চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে নরেশের দাদা বাড়ি ঢোকে।—মাদার। বাবাকে দেখতেই উচ্ছ্বাসটা চাপা পড়ে যায়।

—চা দেবে মা।

—হ্যাঁ, দাঁড়া। নরুর ঘরে যে-ছেলেটা শুয়ে আছে, তার জ্বরটা দেখ তো।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হয় না। বিস্ময়ের চোখে বাবার দিকে তাকায় খোকা। নরেশের ঘরের দিকে এগোয়। মা-ও এসে দাঁড়ায়।

—খোকা, তুই একটু তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যা। পুড়ে যাচ্ছে গা-টা। সেই দুপুর থেকে অবশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

এবার সব পরিষ্কার। অবাক লাগে খোকার এই ছেলেগুলোকে দেখলে সাধ করে কী যে কষ্ট করছে! ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনাই উচিত। ছেলেগুলোর প্রাণের দাম আছে।

১৭

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মিনু ঘর-বার করছে। অশোকের আজ আসার কথা। মাস দেড়েক আগে সেই যে গেছে, আর আসে নি। শহরে নাকি বেশী আসতে নেই। মাঝে একবার একদিনের জন্য এলে কী এমন ক্ষতি হত! অশোক সাধারণতঃ বিকেলের মধ্যে চলে আসে। এখনো আসছে না কেন? ওদের মিটিং কী আজ, না কাল? আজ রাতে হলে হয়ত এসেই বেরিয়ে যাবে। যদি অশোক দুপুরেই আসে, একা বসে থাকবে—এই ভেবে মিনু কলেজ যায় নি আজ। অশোক এখনও জানে না, মিনু পাশ করেছে। বলার মত কিছু নয় অবশ্য—তিন দাঁড়ি, আর ইংরেজীতে তো টায়ে টায়ে। কলেজে ক'দিন ক্লাশও করে ফেলেছে। ভর্তি হওয়ার ঠিক কথা ছিল না। নিজেকে বুঝিয়েছিল, পড়ে আর কী হবে! দীপুর কাছে আর ঋণ বাড়াবার ইচ্ছে ছিল না। দীপুর ওপর ওর আর কোন অধিকারবোধ নেই।

সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছিল, পেছনে ফেলে আসা সেই দিনগুলো মনে পড়ে মিনুর। সে একটা বয়েস, যখন ইচ্ছে হয় কেউ একজন বিশেষ করে তাকেই ভালবাসুক। দীপু ওদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত। মিনুর মা তখনো সুস্থ, তিনি খুব ভালবাসতেন দীপুকে। বলতেন, এই না হলে ছেলে! এইটুকু বয়সে সংসারের সব দায় মাথায় নিয়েছে। মা-ভাইয়ের প্রতি কী কর্তব্য! সংসারটা নাহলে ভেসে যেত। নিছক কর্তব্যবোধ থেকেই হয়ত মা'র অসুখে মিনুর পড়া বন্ধ করার কথা যখন হল, তখন দীপু মিনুর বাবাকে বলেছিল—স্কুলটা ছাড়াবেন না। মাসে গোটা পনেরো টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কৃতজ্ঞ চোখে নতুন করে দেখেছিল দীপুকে। তারপর মিনুই এগিয়েছিল।

একটানা সোজা দাঁড়িয়ে থেকে অস্বস্তি হচ্ছে। গা-টা ম্যাজ-ম্যাজ করছে। বাইরের বেড়ায় হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ মেলে থাকে। কানের পাশ দিয়ে এক গোছা চুল ঝুলে আছে। এক মাথা কালো চুলের মধ্যে মিনুর

আকাশে ফর্সা মুখটা ফুটে আছে। আকাশের শেষ আলোটুকুও অন্ধকার শুষে নিচ্ছে। গলির মুখে ভাই মিন্টুকে ঢুকতে দেখে মিনু। রাস্তার আলো একবার জ্বলেই নিভে গেল।

—এখানে দাঁড়িয়ে আছিস?

—এমনি।

মিনুর মাথার ওপর একপাল মশা ভীড় করেছে। মিনুর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। সামনের গলির মোড়ে কুণ্ডুদের বাড়িটা তখনও হয় নি। পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলতো ওখানে। সন্ধ্যে হলেই মাথার কাছে এমনি মশা জমতো। মশাদের সুর নকল করে চু-উ-উ করে ছুটত ওরা মাঠের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। প্রথমে মশাগুলো এলোমেলো ঘুরত। তারপর ঠিক আবার মাথার ওপর জমে যেত। রাস্তার আলো জ্বলল। জ্বলে উঠল কুণ্ডুদের নিওন আলো। নাঃ, ঘরে গিয়ে বসাই ভাল। অশোক আজ আর আসবে না।

ঘরে এসে চৌকিতে বসে মিনু। অশোকের বইয়ের ব্যাগটার দিকে তাকায়। অনেক বই আছে ওর ভেতর। ফ্রীডম রোড, ফর হুম দি বেল টোলস, অল কোয়ায়েট পড়ে ফেলেছে। দীপুর কাছে এ-জগতটা অজ্ঞাত। নতুন একটা পৃথিবী গড়ে উঠছে। মানুষেরা নিজেদের বদলাচ্ছে, দুনিয়াকে পাল্টাচ্ছে। কোন শোষণ থাকবে না, এমন একটা দুনিয়া গড়া—এ-সব কথা শুনলেই দীপু হেসে ওঠে। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়—ও মার-মার কাট-কাট অনেক হয়েছে। বদলেছে কিছু? দীপু ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে না। এক-দিকে ঘুণ ধরছে। আরেকদিকে সাচ্চা মানুষেরা জোট বাঁধছে। মিনুর মনে আছে দীপুই একদিন বলেছিল—ভাল লাগছে না এ-শালার চাকরি। বীরেশ্বর বেটা খাটাবার বেলা ফুল টাইম ছেড়ে ওভার টাইম। পয়সার বেলা নেই। বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে দীপুর ভেতরেও। কিন্তু পুরোটা ধরতে পারছে না। আচ্ছা, এমন কেন হয়? দীপুও তো মেহনতী মানুষ। অশোককে জিজ্ঞেস করতে হবে।

হাঁটু আর কোমরের কাছটা টনটন করছে। কোমরটা ধরেও আছে। এই সময়টা বড় বাজে লাগে। অশোক কেন যে এল না! গত দেড় দু'মাস ভরা বর্ষাকাল। এ-সময়ের গ্রামে বড় সাপ। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অশোক কী আমাকে···আচ্ছা আমি কী অশোককে···মানে, নাঃ ওরা হয়ত এসব ভাবেই না। এসব ছোট ভাবাবেগ নিয়ে তো আর ওদের চলে না।

না-ই বা কেন ? অত কাজের ভেতরেও 'রবার্ট' কী 'মারিয়া'র কথা ভাবে নি। যে-লড়াই দু'হাতে লড়বে, সে লড়াই কী আর চার হাতে করা যায় না। শেষ-দিন যাবার সময় অশোক অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল মিনুর দিকে। কী দেখছিল অমন করে! মাথার বালিশ টেনে নিয়ে আধশোয়া হয়ে চোখ বোজে মিনু। কাঁধে গামছা, পরনে লুঙ্গি, একদল কৃষকের সঙ্গে বসে অশোক হুঁকো টানছে। কেমন লাগবে দেখতে ?

গলিতে কার যেন পায়ের শব্দ। মিনু উদগ্রীব হয়ে থাকে। মিণ্টু আব সন্তু এত চেঁচিয়ে পড়ে!

—কে ?

চমকে উঠে বসে মিনু। সুজিতদা। সুজিত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, যেন ভেতরে আসাব অনুমতির অপেক্ষায়।

—আসুন।

মিনু আঁচল সামলে উঠে পড়ে। শরীর খারাপ আর আশাভঙ্গের বিরক্তি মিলে ভাল লাগছে না মিনুর।

—আজ কিন্তু চা খেতে হবে।

—তা খাবো। কিন্তু অশোক আসে নি ?

—না। এখনো তো আসে নি। আপনি বসুন। আমি চা করে আনছি।

মিনু যেন আড়ালে সরে যাবার জন্যেই তাড়াতাড়ি চা করতে যায়। মিণ্টু এসে উঁকি দেয়। সুজিত ডাকে। নাম কি তোমার, কোন ক্লাসে, কোন কোন স্কুলে—প্রথম আলাপের বাঁধা প্রশ্নগুলোর পর সুজিত একটা টাকা বার করে। মিণ্টুর দিকে এগিয়ে দেয়।

—আট আনার ডালমুট আর তোমাদের জন্য লজেন্স নিয়ে আসবে।

একটু যেন ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে সুজিত। মিণ্টু হাত গুটিয়ে নেয়।

—এই দিদি।

মিনু রান্না ঘর থেকে এ ঘরে আসে। সুজিত মিণ্টুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জিজ্ঞেস করে—মুড়ি আছে ?

—হ্যাঁ, খাবেন ?

—পেলে মন্দ হয় না। অফিস থেকে সোজা এসেছি। মিণ্টু, চটপট।

মিণ্টু অসহায় মুখে মিনুর দিকে তাকায়, তারপর বেরিয়ে যায়।

চা-মুড়ি পর্ব শেষ হলে সুজিত উইলস-এর প্যাকেট বার করে। একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে ধরাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয়—এই, এখানে ধরাবো ?

—খেতে পারেন, অশোক তো বাবাকে বলে নিয়েছে।

মিনু সামনে বসে, সুজিতের বুক পকেটে পেনের সোনালী খাপটার দিকে চেয়ে আছে। সোনালী রঙে লণ্ঠনের হলদে আলো পড়ে কেমন এক সোনালী মোহ সৃষ্টি হয়েছে।

সুজিত সিগারেটে দুটো টান দিয়ে মিনুর দিকে তাকায়। মিনুর পাশেই টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা। ফিকে হলদে শাড়ি, তাতে লাল সরু দাগের কয়েকটা পাড়। একটু গাঢ় হলদে ব্লাউজ। চুলটা একটু উস্কোখুস্কো। মুখে শ্রান্তির ছাপ। কপাল ডিঙিয়ে কয়েকটা চুল গালের পাশে দোল খাচ্ছে।

এভাবে চুপ করে বসে থাকাটা ভারি বিচ্ছিরি। সুজিতদা কী ভাববে !

—অশোকের সঙ্গে কোন দরকার ছিল ?

—না এমনি। জানতাম যে ও আজকে আসবে। এর আগের দিন একটা বই নিয়ে ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। বলেছিলাম ওকে পড়তে দেবো।

মিনু খেয়াল করে সুজিতের হাতে একটা বই আছে। নামটা পড়ে নেয় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা'। হঠাৎই মিনুর মনে একটা প্রশ্ন জাগে, কেন কে জানে।

—আচ্ছা সুজিতদা, সংশোধনবাদ বলতে কী বোঝায় ? মানে সহজ করে। আজ সকালে রাজু একটা লিফলেট দিয়ে গেছে, তাতে অনেকবার আছে কথাটা।

সুজিত সিগারেটে টান দেয়। কোথায় ফেলবে—এদিক ওদিক তাকিয়ে অ্যাশট্রে না দেখে মেঝেতেই ফেলে জুতো দিয়ে চেপে দেয়।

—সংশোধনবাদ হচ্ছে···

সুজিত একটু থামে, মনে মনে যুৎসই কথা সাজাতে থাকে।

—কি জান, এই, সমুদ্রের জলে যখন খুব ঢেউ ওঠে তখন তেল ঢেলে দিলে ঢেউ কমে আসে, জান তো ? সমুদ্র উত্তাল হয় না, তাহলে ব্যাপারীর জাহাজ ডুবে যাবে। তেমনি শোষকদের ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাতে, উত্তাল জন-সমুদ্রকে ঠাণ্ডা করার তেল হচ্ছে সংশোধনবাদ।

কথাগুলো ভাল লাগে মিনুর। সমুদ্র কখনও দেখে নি ও। জন-সমুদ্রের

কলোচ্ছ্বাসটা যেন চেনা। দশমীর দিন মহানন্দার ধারে ভাসানের মেলার শব্দ আর কলেজের দেওয়ালে লেখাটা মনে পড়ে—বিপ্লব জনগণের উৎসব।

সুন্দর করে বলতে পারায় গর্ব অনুভব করে সুজিত। আরো কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সব বুঝেও সক্রিয়ভাবে বিপ্লবের কাজে যুক্ত না হওয়া অপরাধবোধ চুপ করিয়ে দেয়।

—পূজোতে বাড়ি যাবেন না ?

—ভাবছি, যাব না। গিয়ে তো খাওয়া আর আড্ডা দেওয়া। পুরোনো একপাল বন্ধু আছে। সিনেমা আর মেয়ে-চর্চা।

বলেই খেয়াল হয়, মেয়ের সামনেই মেয়ে-চর্চার কথা। ছিঃ, দিন দিন যে কি হচ্ছে।

—ভাবছি, এখানেই থেকে ছুটির কটা দিন পার্টির কাজ করবো।

—কলকাতায় আপনার বন্ধুরা এখনও বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করে ?

—সবাই কী আর অশোক-জহরদের মত গ্রামে চলে এসেছে ভেবেছো ? রকে আড্ডা ঠিকই চলেছে। তবে কমেছে, এ-কথা সত্যি।

—জহরদারা অদ্ভুত, না ?

—হ্যাঁ ওরা হচ্ছে অগ্রণী-বাহিনী।

অন্যদের চেয়ে নিজেকে ছোট করে ভাবতেও খারাপ লাগে সুজিতের।

—আমিও অনেক কিছুই করি। যতভাবে সাহায্য করা যায়। তবে চেষ্টা করলে আরও অনেক কিছুই করা যায়।

—ঠিকই বলেছেন, আমাদের আরও বেশী চেষ্টা করা উচিত।

এই 'আমাদের' বলাটা সুজিতের খুব ভাল লাগে। আমি ছেড়ে আমরাতে পৌঁছোলেই যেন জোর পায়।

—মিনু তুমি আমি কেউই একা জোর পাচ্ছি না।

দীপু, না অশোক—চলার পথে আগেই একটা বাঁক নিয়েছে, তারপর সোজা পথে ছুটে চলেছিল মিনুর মনটা। হঠাৎ যেন একটা হোঁচট খেল। কী বলতে চায় সুজিতদা ?

সুজিত আরেকটা সিগারেট ধরায়। মিনুর বাবা বাড়ি ঢোকেন। বাবাকে দেখেই যেন খেয়াল হয় মিনুর, উনোনে আঁচ বয়ে যাচ্ছে। কিছু না বলেই উঠে বেরিয়ে যায়। সুজিত সিগারেট ফেলে দেয়।

—কতক্ষণ ?

—এই কিছুক্ষণ হল।

—তারপর, পে-কমিশনে মাইনে কিছু বাড়বে মনে হচ্ছে ?

—তা বাড়তে পারে। তবে বেড়েই বা কী লাভ বলুন ? নোট ছাপাতে তো আর অসুবিধে নেই।

—ঠিকই বলেছ। টাকার কী আর কোন দাম আছে। চাকরিতে ঢুকেছিলাম চল্লিশ টাকা মাইনেতে, এখন দেখ তার চার পাঁচ গুণ বেশী পেয়েও যে তিমিরে সেই তিমিরেই। তবু মাসে ক'টা টাকা যদি বেশী হাতে আসে আর কি। ওঠছো নাকি ?

—হ্যাঁ, যাবো এবার।

সুজিত উঠে পড়ে। এসব আলোচনা আর ভাল লাগে না আজকাল। সুজিতের সঙ্গে মিনুর বাবাও বাইরে আসেন।

—ও মিনু, সুজিতকে চা-টা দিয়েছিস তো ?

—হুঁ।

মিনু রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। মেয়ের সাজগোছ দেখে একটু অবাক হন। একটাই ভাল শাড়ি, বাড়িতে তো কখনো সেটা পড়ে থাকে না।

—আবার আসবেন, সুজিতদা।

—আসবো। আর অশোকের জন্য বইটা রেখে গেলাম। আসি, মেসোমশাই।

মিনুর বাবা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। দীপুর আসা-যাওয়াটা যেন কমেছে। সুজিত ছেলেটা মন্দ না। তবে দীপুর সঙ্গেই তো…

—মিনু, তুই কি কোথাও বেরিয়েছিলি ?

—না তো, কেন ?

—না, এমনি।

যাকগে, ভেবে কি লাভ! বিয়ে দেবার যখন সামর্থ্য নেই, যেভাবে পার হয় হোক। সুজিত ছেলেটার মাইনে টাইনেও বেশী। ভবিষ্যতে হয়ত আরও উন্নতি করবে! তবু দীপু নয়, ভাবতে একটা অপরাধবোধ কাজ করে। এত করেছে ছেলেটা। মিনুর মা'র অসুখের সময়, মিনুর পড়ার খরচা, এমনকি কখনও দু-পাঁচ টাকার দরকার হলে দীপুর কাছ থেকেই নিয়েছেন কখনো সখনো। মিণ্টু-ঝুনুর পড়ার জোর বেড়ে গেছে। এখন আর ঢুলুনি আসছে না, বাবা

বাড়িতে। খোকন মা'র কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে। মায়ের একটা হাত খোকনের মাথায়। ঘরে ঢুকে জামা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

—মিনু, রান্নার কত দেরী?

—একটু দেরী আছে। সুজিতদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

—দীপু অনেকদিন আসে না তো রে, মা। কী হল?

—জানি না। আসবে হয়ত।

কোথায় যেন হিসেবের গণ্ডগোল হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছেন না।

—ঘুমাও নাকি, মিনুর মা?

—না।

—ছেলেমেয়ের দিকে একটু নজর রাখতেও তো পারো!

—আর আমার নজর রাখা।

মুদির দোকানের ধার শুধতে গিয়ে গত মাসে ওষুধ আসে নি। এ-মাসেও আনতে পারলেন না। পুরোনো খালি শিশির দিকে চোখ পড়তেই চুপ করে যান। অর্থই সামর্থ্য। আরা পারা যায় না।

১৮

জহর টাইপ-করা কাগজটা ভাঁজ করে একপাশে রাখে। শ্রীকাকুলামে সোমপেতার কৃষক গেরিলারা অত্যাচারী জমিদারকে খতম করেছে। সেই অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে পার্টি-নেতৃত্ব দশ পয়েন্ট একটা নির্দেশ গ্রামের পার্টি-কমিটিগুলোর কাছে পাঠিয়েছেন। সবাই চুপচাপ। ওরা দশজন কুতুবপুরের একটা ফাঁকা বাড়িতে মিটিং-এ বসেছে। আটজন গ্রামের কর্মী, নরেশ আর গোবিন্দ শহরের। কেউই যেন ঠিক বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছে না। বরুণ অনেকগুলো শব্দের মানে বুঝতে পারে নি—এই নির্দেশগুলো যে কেন ইংরেজীতে পাঠায়! রবীন নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে সিগারেটে টান দিচ্ছে। এসব তো ওর জানা। কলকাতায় পার্টি-সম্পাদকের সঙ্গে বিপ্লবী কৃষক-কর্মীদের মিটিংয়েই ছিল। নতুন করে আর কী ভাববে? নরেশ মাঝে মাঝে জহরের দিকে তাকাচ্ছে—ভাবটা, যাহোক কিছু বল না বাবা। গোবিন্দ দেশলাইয়ের

বাক্সে সিগারেট ঠুকছে, খুব গম্ভীর, যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে। আসলে ও ভেবে পাচ্ছে না, কী ভাববে। ব্যাপারটা যা বুঝলো পুরোই গ্রামের ব্যাপার, শহরে এর জন্য কী করার আছে, সেটা জহর বা রবীন বলে দিলেই ও লেগে যাবে। নৃপেন মনে করার চেষ্টা করে, শিলিগুড়িতে এরকম কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা আগে হয়েছিল কি না। বরুণের একটা সরষে সরষে ঢেঁকুর ওঠে ও মালদারই ছেলে। গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে এলে বাড়িতে ভালমন্দ খাওয়া জোটে। বিষ্ণু ভাবতে চেষ্টা করে এই নতুন কাজের ধারা, এতদিন যেভাবে কাজ করেছে তার সঙ্গে কীভাবে মেলাবে।

ঘরটার জানালা-দরজা সব বন্ধ। সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়ায় দম আটকে আসছে। কোন এক সমর্থকের বাড়ি। বাড়িসুদ্ধ সবাই ক'দিনের জন্য বাইরে কোথায় গেছে। নরেশ চাবিটা নিয়ে রেখেছে। শহরের শেষ মাথায় এ-অঞ্চলের বিপ্লবী-সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে ব্যস্ত দশজন।

—এদ্দিনে একটা লাইন পাওয়া গেলা। দেবেন বেশ জোরের সঙ্গে বলে। সমর্থন পাবার আশায় সবার দিকে তাকায়। রবীন গম্ভীরস্বরে বলে—অন্য সমস্ত জেলার কমরেডরা এ-লাইন অ্যাকসেপ্ট করেছেন। শিগ্‌গিরই বাংলার প্রতিটি জেলায় জমিদার-খতম অভিযান শুরু হবে।

রবীন যেন বেশী আলোচনার পক্ষপাতী নয়। নেতৃত্ব বলেছে, অন্য সবাই মেনে নিয়েছে, ব্যস। জহরের মাথায় চেয়ারম্যানের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে, সুদৃঢ় গণভিত্তি ছাড়া সমতল অঞ্চলে লড়াই টিঁকে থাকতে পারে না। প্রস্তুতি-বিহীন উৎকৃষ্ট অবস্থা উৎকৃষ্ট অবস্থা নয়। ও ঠিক বুঝতে পারছে না, এই আটজন কর্মী ক'জন কৃষকের কাছে পার্টির বক্তব্য নিয়ে পৌছোতে পেরেছে? গাজোলেই তো ও প্রায় মাস নয়েক আছে, ক'জন কৃষক সঙ্গে আছে? পাঁচ-সাতটা গ্রামে কোথাও পাঁচজন কোথাও তিনজনের পার্টি-কমিটি। আর সাধারণ সমর্থক প্রচারকের সংখ্যাই বা কত, আরও জনা তিরিশ। যে ধরণের শেল্টারের কথা বলা হয়েছে, মধ্যবিত্ত কর্মীর আশ্রয়স্থলের আশপাশের বাড়িগুলোও যেন সব সমর্থক হয়, এমন শেল্টার ওর এলাকায় একটাই হতে পারে। এমনিতে থাকতে পারে ও অনেক বাড়িতেই।

—তাহলে কমরেড, প্রত্যেকে নিজের এলাকার বিশেষ অবস্থা ও কাজের অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে বলুন, কাজের এই নতুন লাইন আমরা কীভাবে প্রয়োগ করতে পারি?

সবাই জহরের দিকে তাকায়। যেন ওর কাছ থেকেই শুনতে চায়, কী করা যায়। রবীনের এটাই খারাপ লাগে।

—কমরেড, আমার মনে হয়, আমাদের দেরী না করেই খতম শুরু কর উচিত। আমাদের এক্ষুণি হিসেব করে ফেলা উচিত, কার এলাকায় ক'ট স্কোয়াড তৈরী সম্ভব। আমি নিজের এলাকা সম্বন্ধে ভেবেছি, তিনটে স্কোয়াড তৈরী হবে বলে মনে হয়।

জহরের অবাক লাগে এত সহজে এ-কথাগুলো বলে কী করে রবীন! তিনটে গেরিলা দল মানে অন্ততঃ চৌদ্দ পনোরোজন কৃষক খতম করতে তৈবী। কলকাতা থেকে ফিরে গত সাতদিনে ও নিজের এলাকায় কৃষক কমরেডদের সঙ্গে কথা বলেছে। সম্পূর্ণ চক্রান্তমূলকভাবে পার্টির নির্দেশ মতই করতে চেষ্টা করেছে। জনা-ছয়েক বলেছে, তারা রাজী। কিন্তু জহরের দ্বিধা, উদ্যোগ পুরো মধ্যবিত্ত-কর্মীর হাতে থাকছে। বাকী কয়েকজন বলেছে, খতম করা তে উচিত, আচ্ছা সবাই গেলে যাবো। কাটা উচিত জোতদার মহাজনদেব— এ-ব্যাপারে কারুর দ্বিধা দেখে নি জহর। কিন্তু নিজে একাজে এগিয়ে আসতে শেষ অব্দি ক'জন থাকবে, ওর সন্দেহ আছে।

—কমরেডস, কমরেড রবীন যা বললেন সেটা আশার কথা। আমরা মিটিং-এ রিপোর্টিং করার সময় যেন সাবজেকটিভিজম না করি। আমাদের ইচ্ছায় বিপ্লব হবে না, কমরেড। বিপ্লব করবে জনগণ। বাস্তব অবস্থার মূল্যায়নে আমরা যেন ভুল না করি। আমি ও রবীন ছাড়া এ-লাইন নিয়ে কৃষক-কমরেডদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ বাকিরা পান নি। যদি প্রয়োজন আছে মনে হয়, তাহলে আরও সময় নেওয়া উচিত। যুদ্ধ ঘোষণা করা সোজা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা কঠিন। আমরা কিছুদিন এলাকার মানুষের ও কৃষক-কর্মীদের মতামত নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

অশোকের এখনও গায়ে জ্বর আছে, মাথাটাও ধরে আছে। এককোণে চুপচাপ বসে আলোচনা শুনছে, ওর মনে হচ্ছে—এতদিন কৃষি-বিপ্লবটা কোন সুদূরের অপরিচিত স্বপ্ন ছিল। কত বছরের পর বছর ধৈর্য ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কৃষকদের সংগঠিত করতে হবে, তবে বিপ্লব হবে—এ-চিন্তায় মাঝে মাঝে হতাশা আসতো। শ্রীকাকুলাম—ভারতের ইয়েনান পথ দেখাচ্ছে। কৃষি-বিপ্লব এখন প্রত্যক্ষ প্রায়োগের প্রশ্ন। পার্টি নেতৃত্ব যেন গ্রামের কর্মীদের দিশা নির্দেশ করে দিয়েছেন, যদি বিপ্লব করতে চাও—এই হচ্ছে পথ।

—কমরেড স্বপন যা বললেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত। আমরা আরও অনুসন্ধান করতে পারি। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হচ্ছে, গ্রামের কাজের এই নতুন লাইনকে আমরা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করছি কিনা। আমি সবাইকে ভাবতে অনুরোধ করবো এবং নিশ্চয়ই সবাই এটা উপলব্ধি করেছেন, আমাদের সামনে এদ্দিন গ্রামের কাজের কোন লাইন ছিল না। আমরা প্রচার করেছি, সংগঠন গড়েছি, হয়ত খুব বেশী পারি নি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃষকেরা শোষণের চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছে। ওদিকে শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার ভাঙ্গন তীব্র হয়ে উঠেছে। তাদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো ভাঙ্গছে। ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলোতেও। এদিকে মানিকচকে কিছু বাঁশ ও গাজোল বামনগোলায় কিছু জোতদারের জমি থেকে ধান কেটে নেওয়াই আজ অব্দি আমাদের নেতৃত্বে হয়েছে। একাজ শোধনবাদী পার্টিগুলোও করে। এতে শোষণের মূলে আঘাত করা যায় না। শোধন-বাদীদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য-রেখাই হবে প্রথমে। অশোক শেষ করে।

দেবেন যেন জোর পায়—কমরেডস, আমারও মনে হয় অত ভাবাভাবির কিছু নেই। তিন-চারজন কৃষক কাটতে রাজী থাকলেই শুরু করা উচিত। আমরা নিজেরা কি ভয় পাচ্ছি ? যারা ভয় পাচ্ছে তাদের তাড়াতাড়ি ফোটা উচিত।

—কমরেডস, গতবার যখন শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম তখন এ-ধরণের একটা লাইন নিয়ে আলোচনা শুনেছিলাম। এই নতুন লাইন উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় কীভাবে কমরেডরা প্রয়োগ করছেন, সেদিকে আমাদের নজর রাখা উচিত।

দেবেন বিরক্ত হয়, এই শালার শুরু হল শিলিগুড়ি॥ পিকিং-এর পরেই যেন বিশ্ববিপ্লবের হেডকোয়ার্টার। জহরের এটা বড় খারাপ লাগে। নৃপেন শিলিগুড়ির ছেলে। কলকাতার ছেলেদের নেতৃত্ব মেনে কাজ করতে কোথায় যেন ওর লাগে। জহরের মাঝে মাঝে মনে হয় যেহেতু এখানে ওরা যারা কাজ শুরু করেছিল, তারা কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে প্রথম থেকে ছিল না, তাই বোধ হয় পার্টি তথা উত্তরবঙ্গের নেতৃত্ব ঠিক এখনও ওদের বিশ্বাস করে না। পার্টি-নেতৃত্বের তরফ থেকেই শিলিগুড়ির একজনকে এখানে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে পাঠানো হোল। নৃপেন এসেই এতদিনের সব কাজের সবটা না বুঝেই নাক গলাতে, আর প্রতি কথায় উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য আনতে সচেষ্ট

হল। অনেক একথা সে কথার পর নৃপেন শেষ করে—আমাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় তো আমি শিলিগুড়ি গিয়ে উত্তরবঙ্গের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে কথা বলে আসতে পারি।

—না কমরেড, তার আর আর দরকার নেই। সি. ও. সি-র এই সম্পূর্ণ এলাকার ভারপ্রাপ্ত কমরেড সোমেনদাও কলকাতার মিটিং-এ ছিলেন। এখন আমরা কীভাবে কী করবো, তা ঠিক করাই দরকার। রবীনের স্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ে।

—কমরেড জহর যা বলেছেন, তা ঠিক। আমার মনে হয়, এলাকায় কথা না বলে কিছু বললে বাস্তবের সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। কৃষক কমরেডদের ওপর চাপিয়ে দেবার তো প্রশ্ন ওঠে না। তবে লড়াই শুরু করা উচিত। বিষ্ণু শেষ করে।

রবীন বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করে—আমাদের এলাকাকে কী আমরা ভাল করে চিনি না, কমরেড? নিশ্চই চিনি। মোটামুটি ক'টা স্কোয়াড হবে হিসেব করে নিলে বোধ হয় আলোচোনার সুবিধে হবে।

—আপনার এলাকায় ক'টা স্কোয়াড হবে মনে হয়? বিষ্ণুব দিকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় রবীন।

—আমি এক্ষুণি বলতে পারছি না। এই পর্যায়ে গেরিলা দল-গঠনের কথা আগে ভাবি নি তো!

—কমরেড দেবেন কী বলেন?

—একটা তো হবেই। দুটো ধরতে পারেন। সাতজনের বেশী নয়, নির্দেশে বলা হয়েছে। কম মানে তিনজন চারজন হতে পারে তো?

—নিশ্চয়ই। কমরেড রজত চুপ কেন?

কলকাতায় কসবা চত্বরে মস্তান হিসেবে খ্যাতি ছিল রজতের। কসবায় সি পি এম-এর সঙ্গে ঝামেলায় পাড়া ছাড়া হতে হয়েছিল ওকে। তারপর গ্রামে এসেছে। প্রচণ্ড সাহসী আর পরিশ্রমী কর্মী। কৃষক দু-একজন আছে সাহসী, ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেক'টা বলবে সেক'টা খতম করে দেওয়া যাবে।

—কমরেড জহর কী বলেন?

—আমার মনে হয় কমরেড, ফসল কাটার সময়ের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে ছাড়া আমার এলাকায় লড়াই চালানো সম্ভব হবে না।

—কিন্তু তার আগেই যদি শুরু করা যায় আর ফসল কাটার সময় চরমে তোলা যায় তাহলে? এখন স্কোয়াড ক'টা হতে পারে?

—আমি খুব বেশী আশাবাদী নই, কমরেড। একটা স্কোয়াড সম্ভব সব মিলে।

আলোচনা এগোতে থাকে। রবীন হিসেব শেষ করে। সব মিলে প্রায় বারো-তেরটা স্কোয়াড। রবীন প্রচণ্ড উৎসাহ পায়—কমরেডস এ একটা দারুণ অবস্থা। আমরা স্কোয়াড তৈরী করে সিদ্ধান্ত নেবার পর ভাবুন জেলার অবস্থা। ধরেই নিচ্ছি দিন দশেক চেষ্টার পর টারগেট পাওয়া গেল। দশ দিনের মধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তেরটা শ্রেণীশত্রু নিকেশ। তার পরের দশ দিনে কম করেই ধরছি আট-দশটা। ভাবুন, কৃষক জনতা প্রত্যেকটি অ্যাকশনে কী বিপুল উৎসাহ পাবে! তারা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে এগিয়ে আসবে। এতদিন কাজ করে আমরা যা পারি নি, আগামী একমাসেই তার কতগুণ কৃষককে লড়াইয়ে টেনে আনতে পারবো।

ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে সবার। উত্তেজনায় ঘরের উত্তাপ বেড়ে গেছে। গোবিন্দ হাতে হাত ঘষছে। অনেক-দিন ধরে গ্রামে যাবো যাবো করছে। আর নয়। এই বিরাট ব্যাপার ও ঠিক ভাবতে পারছে না।—আচ্ছা, নতুন যারা গ্রামে যাবে, তারা কী করবে?

গোবিন্দ উদ্বেগের চোখে জহরের দিকে তাকায়। জহর বিড়িটা মুখে নিয়ে সবে দেশলাইয়ের কাঠি বার করেছে। চোখ দেশলাইয়ের দিকে থাকলেও ও বুঝতে পারে উত্তরটা ওকেই দিতে হবে।

—বিস্তৃতির কাজ থামালে চলবে না। তিনটে প্রেসিং-এর ব্যবস্থা হয়ে আছে। শ্রেণীশত্রু খতমে যে জন-জোয়ারের সৃষ্টি হবে তাকে সংগঠিত করতে হবে। রাজনীতি প্রচারের কাজও করে যেতে হবে।

—কমরেডস, আমাদের কিন্তু প্রত্যেকের কথা বলা উচিত। বরুণ আর নরেশ মুখ খোল। আরেকটা কথা আমাদের খেয়াল করা উচিত, অ্যাকশন হলে পরেই পুলিশী ঝামেলা অনেক বাড়বে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ, নিজে-দের মধ্যে এতবড় মিটিং করা ঠিক হবে কিনা, শহরে কাজের ধরণ কিছু বদলাবে কিনা, এ নিয়ে ভাবা দরকার। বিষ্ণু শেষ করে জহরের দিকে তাকায়। জহর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

—আরেকটা ব্যাপারও আমাদের নজর যেন না এড়িয়ে যায়। লড়াই খালি

হাতে হবে না। গ্রামীণ অস্ত্র আজকাল কৃষকের ঘরে খুব একটা থাকে না। স্কোয়াড তৈরীর সময় হাতিয়ারের কথা ভাবানো দরকার।

রজতের এই কথাগুলোর দেবেন সায় দেয়।—আর বোমটোম? বিদেশী বিভলবার না হোক, দেশী পাইপগান?

—আগ্নেয়-অস্ত্রের ওপর নির্ভবশীল হলে চলবে না, কমরেড।

—কেন? এই নির্দেশেই তো আছে—মধ্যবিত্ত কর্মীরা ছোট পিস্তল বাখতে পারে। এই জহর পড়্‌না ওই জায়গাটা।

হাতিয়ারেব প্রশ্নে ববীনের এই বিরোধিতায় মেজাজ বিগড়ে যায় দেবেনের।

—টাকা পেলে শিলিগুড়ি কনট্যাক্টে আমি কয়েকটাব ব্যবস্থা কবতে পাবি।

দেবেন বিকট শব্দ করে একটা হাই তোলে। কাছেই একটা পুলিশের হুইসিল বেজে ওঠে। দেবেন, বরুণ ও নৃপেন সচকিত হয়ে এব ওর দিকে তাকায়।

—ও কিছু না, রাত পাহারা। নরেশের স্বরে তাচ্ছিল্য।

ধীরে ধীরে ওদের মিটিং শেষ হওয়ার দিকে এগোয়।

অশোকের শবীব ভাল লাগছে না। নরেশ ঘড়ি দেখে, পৌনে চারটে। মিটিং শেষ হতে না হতেই বরুণ ঘুমিয়ে পড়েছে। জহব ওব দিকে তাকিয়ে ভাবে, একদম বাচ্চা ছেলে। এ-বছবই স্কুল ছেড়েছে। দেবেন আবও গোটা কয়েক হাই তোলে। রজত এককোণে চুপচাপ বসে বিড়ি টানে। গোবিন্দ জহরকে জিজ্ঞেস করে—শোবে তুমি?

—নাঃ, তুই শুয়ে পড।

অশোকের কপালের রগ দুটো দপদপ করছে। দু'হাতে টিপে ধরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়। রবীনের খুব একটা ঘুম পাচ্ছে না। হোস্টেল জীবনে রাতজাগার অভ্যেসটা হয়ে গিয়েছিল। কত রাত যে গপ্পো করে, ব্রীজ নয়ত তিন পাত্তি খেলে কাটিয়েছে। নরেশ আগেই বেরিয়ে বারান্দায় বসেছিল। জহর এসে ওব পাশে বসে। বিষ্ণু ঘরের কোণের ঠাকুরের সিংহাসন থেকে বাতাসার শিশি নিয়ে বাইরে আসে।

—চলবে?

—কা শুরু করেছিস? নরেশ বেগে যায়।—অন্তের বাড়ি, ঢুকতে দিয়েছে বাপের ভাগ্যি। সব ক'টা খেয়ে নিস না।

—না না, একটা করে খা-না।

তিনজনে বাতাসা চিবুতে থাকে। জহর বিষ্ণুকে বলে—দেখ তো, অশোক ঘুমিয়ে পড়েছে ?

বিষ্ণু উঁকি দিয়ে দেখে বলে—হুঁ।

—অশোকের যা শরীরের অবস্থা দেখছি, ক'দিন এখানে বিশ্রাম নিক।

—তাই ভাল।

বিষ্ণু নরেশের কাঁধে মাথা রেখে ঝিমোয়। জহর আর নরেশ কাজের কথা সেরে নিচ্ছে। ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু রজত একা এককোণে বসে পার্টির নির্দেশটা আবার এক মনে পড়ছে। রবীনের চাপে অশোকের ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। তবুও চোখ বুজেই চুপচাপ শুয়ে থাকে। ওর বড় অবসন্ন লাগছে। ক'দিন আগে কালাদেব গ্রামে শোনা সাঁওতালি গানটা মনে পড়ে

খাঁটি গেবোন হুল গেয়া হো,
হুপুচ্ হুপুচ্ দেলাং জা···

সাঁওতালি ভাষাটা শিখতে পারে নি অশোক এখনও। কালা ওকে মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল—কমরেড এ আমাদের গান, কিন্তু পার্টির কথা—আমরা এবার লড়াই করবো, জলদি জলদি চলো।

১৯

শরতের রোদে শহরটা যেন ঝকঝকে লাগছে। অশোকের আজ শরীরটাও একটু ভাল লাগছে। দু'দিন ছুটি। কোন দরকার ছিল না। তবু কমরেডরা বলেছে, অতএব থাকতেই হবে। ওষুধ পেটে পড়তেই জ্বর কমতে শুরু করেছে। হয়ত না হলেও আপনিই কমে যেত। গাঁয়ের চাষীরা জ্বর জ্বালাতে না ডাক্তার ডাকে, না ওষুধ খায়। নরেশের বাড়ি থেকে মিনুদের বাড়ি অব্দি হেঁটে এসে এখন অবশ্য একটু ক্লান্ত লাগে অশোকের। অশোক মিনুদের বাড়িতে ঢোকে। মিনুর ছোট ঘরটায় রং-চটা একটা টেপা তালা ঝুলছে। গেল কোথায় ? অশোক পাশের ঘরটায় যায়। এই ভর-দুপুরেও ঘরটা কেমন যেন অন্ধকার। নরেশদের বাড়িটা খুব ঝকঝকে।

—কে ? মিনুর মা উঠে বসে। খোকন ঘুমোচ্ছে, নাড়ু-সন্তু নিশ্চয়ই স্কুলে গেছে।

—আমি, মাসিমা।

—ও অশোক। বোসো, বাবা।

অশোক চৌকির একধারে বসে। বিছানায় একটা সবজে চাদর পাতা, মাঝে মাঝে ফেঁসে গেছে।

—মিনু তো কলেজে গেছে। ওর বাবা অফিসে। আজ থাকবে তো ?

—হ্যাঁ।

মিনু কলেজে, মানে মিনু পাশ করে গেছে। অশোকের এসব ঠিক খেয়াল থাকে না। মাঝে মাঝে খেয়াল হয়, স্কুল-কলেজ-অফিস-কাছারির আলাদা জগত আছে। সবাই ওর মত শুধু বিপ্লবই করে না।

—বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছো।

—হ্যাঁ, এই একটু ভুগে উঠলাম।

—কী হয়েছিল ?

—কিছু না, সামান্য জ্বর।

—ওষুধ-বিষুধ খেয়েছো ?

—হ্যাঁ।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয় মিনুর মা'র। এমনিতেই হাঁপানির রুগী তার ওপর একটা বড় ধাক্কা গেছে। রোজ দুটো করে ট্যাবলেট বলেছিল ডাক্তার। তা গত ক'মাস ধরে আর জোটে না।

—আচ্ছা বাবা, তোমরা যখন মন্ত্রী হবে তখন তো বিনে পয়সায় ওষুধ পাওয়া যাবে, না ?

একটা যেন ক্ষীণ আশা। অশোক নিজেও ঠিক জানে না কী হবে। কী বলবে ভেবে পায় না।

মিনুর মা নিজেই বলেন—তখন তো হবেই। তোমরা তো গরীবের দুঃখ বোঝো। গরীবের রাজত্ব হবে আর এটুকুন হবে না।

এরপর আর কী কথা বলবে অশোক ! ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কোণে অনেক ছোট ছোট স্বপ্ন গড়ে উঠেছে।

—আমি একটু ঘুরে আসি; মাসীমা।

মায়েরা ভারি অদ্ভুত হয়। ছেলে পার্টি করছে, তাই অশোকের মা-ও

ছেলের পার্টিকে সমর্থন করে। কিন্তু বাবা নয়। বাবা পার্টির কাজের কড়া সমালোচক। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় দেখে, দুর্গা প্রতিমা রং করছে। পুজোর দিনক্ষণগুলো এতই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে যে, মনেই পড়ে না। পকেট থেকে পয়সা বার করতে করতে সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়ায়।

—এই দুটো কেন?

অশোক পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে দেবেন। একটু অবাক হয়।—কি রে, যাস নি?

—পেটটা ভাল নেই গুরু, এখানকার জলে যা আমাশয় হয় না।

অশোক জানে দেবেন ছোটো-খাটো ছুতো করে শহরে চলে আসে।

—তোর শরীর কেমন? ভালই তো দেখাচ্ছে।

—হ্যাঁ, ভাল।

দুজনে সিগারেট ধরায়।

—তোর কোন কাজ আছে এখন?

—নাঃ, চল না কোথাও বসি।

—চা খাবি?

—না রে, চা-এর অভ্যেসটা প্রায় ছেড়েছি।

—সিনেমা দেখতে যাবি?

—দুর, পয়সা কামড়াচ্ছে?

অশোকের মনে হয়, সত্যিই তো অনেক দিন সিনেমা দেখে নি। মনেও পড়ে নি।—চল এমনি কোথাও বসি।

—নাকি টাউন সংগঠনের মিটিং আছে বিকেলে, সেখানে যাবি?

—আমরা কেন যাবো?

ওরা এগোতে এগোতে কোর্ট-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চারদিকে ভিড়—হাত-দেখা মাদুলি-জড়ি-বুটি থেকে ম্যাজিক পর্যন্ত। পাতলা ভীড় এক একটাকে ঘিরে। কালো কালো জোব্বা গায়ে উকিলেরা এ-দিক ও-দিক। একটা সাঁওতাল জটলা। খালি গা, হাতে লাঠি—পাশে রাখা কয়েকটা পুঁটলি। একজন বাবুমত লোক তাদের কী সব বোঝাচ্ছে। কোন উকিলের দালাল হয়ত। ডান বা বাম-পার্টির ছোটখাটো নেতাও হতে পারে। সব বিক্ষোভকেই ৷ মহামান্য আদালতের কাছে হাজির করে। ওরা কোর্টের মাঠের দিককার

দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার দুধারে শিশু গাছ। এদিকটায় কোনদিন আসে নি অশোক। পার্কের লোহার গেটটা ঠেলে ঢুকে পড়ে দু'জনে। বিরাট বিরাট করবী গাছের ঝাড়। একটার নীচে বসে পড়ে। এক পাশে দোলনার, স্লিপের কাঠামো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। অশোকেব মনে হয়, হায় বে আমাদের দেশের শিশুরা! পরক্ষণেই মনে হয়, এটা ওর মধ্যবিত্ত শ্রেণীচিন্তা হয়ত। গ্রামের শিশুরা যে-দেশে পেট ভরে খেতে পায় না সে দেশে পার্ক তৈরি করা তো অপচয়।

—তাহলে সিনেমা যাবি না?

—নাঃ।

মিনু বিকেলের মধ্যেই ফিরবে। না যাওয়াই ভাল। সিনেমা ও কোন-কালেই বেশী দেখতো না। সেই তো পলায়নী নাচ-গান-মারপিট। মাস-ছয়েক হল দেবেনটা গ্রামে আছে তাও এ-রকম। অশোক শুনেছে, কলেজে রাজ-নীতি করতে শুরু করার পরেও বেশ কিছুদিন বাজে পাড়ায় যাতায়াত করত—বললে নাকি উত্তব দিত বুর্জোয়া পিউরিট্যানিজম ফাইট করছে। পার্টওয়ান পরীক্ষা দিল না। হঠাৎ হুজুগ করে ভোটে খুব খাটল। সংগঠন-গড়ার কাজ কোনদিন করল না। ট্রাম-বাস জ্বালানোর পর্যায়ে হিরো হয়ে গেল। জহর ওকে রসিকতা করে বলে—কবে শহীদ হয়ে যাবি, অন্ততঃ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোটা পড়ে নে। রাজনীতি সত্যি সত্যি কিছু উপলব্ধি করে কিনা সন্দেহ আছে অশোকের। কতগুলো বড় বড কথা শুধু ঠোঁটের ডগায়। তবে ছেলেটা সত্যিই জঙ্গী—কিছুর পরোয়া করে না। সেবার সেই কলেজ স্ট্রীটে ট্রাম ধরানোটা—অশোক ভাবতেই পারে না। পুলিশ গুলি করতে শুরু করেছে। দেবেন ঠাণ্ডা মাথায় পেট্রল ঢালল, আগুন ধরালো।

—কী ভাবছিস?

—উঁ, তোর কথা।

—রসিকতা করছিস?

—না, সত্যি। ও কিরে, তোর কাছে সিগারেট আছে?

—খাবি, নে। এ-মাসেও টাকা কম হয়ে যাবে মনে হচ্ছে

—এসব সিনেমা দেখা ছাড়।

—বুঝি তো রে। সবাই পনেরো টাকা নিয়েছে, আমি আঠারো নিয়েছি, তাও। মাঝে মাঝে শালা কিছুই ভাল লাগে না। তবে এবার লড়াইটা উঠলে জমবে।

—শ্রীকাকুলামের কৃষক-গেরিলারা নাকি জোতদারের মুণ্ডু কেটে বাঁশে লটকে রেখেছিল। আমরা কতটা পারবো?

—অ্যাদ্দিন শালা বেকার সময় নষ্ট হয়েছে। শেল্টার বানাও, কমিটি বানাও আর প্রচার করো। এখন একটা পরিষ্কার লাইন পাওয়া গেল।

—তা ঠিক। কিন্তু কৃষকেরা এ-লাইন কী ভাবে নেবে কে জানে?

দু'জনেই চুপ করে যায়। সামনের বিরাট গাছটার দিকে চোখ পড়ে অশোকের।—গাছটা তো বিরাট রে?

—জানিস না, এটাই তো সেই বিখ্যাত বৃন্দাবনী আমগাছ। কী একটা যেন ইতিহাস আছে! সন্ত্রাসবাদীরা বৃটিশ আমলে জেলা-স্কুলের কোন এক হেডমাস্টারকে এই গাছের নীচেই খতম করেছিল।

—আচ্ছা, কিন্তু হেডমাস্টারকে কেন?

—অত জানি না। জহরকে জিজ্ঞেস করিস।

এক স্নিগ্ধ আলোর প্রশান্তি দিগন্তের কোথাও সূর্যের উপস্থিতির কথা জানান দিচ্ছে।

—এই ওঠ, তোর সিনেমার সময় হয়ে গেল।

—বেশ ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে এমনি চুপচাপ বসে থাকতে বেশ লাগে, না রে।

—তোর বাড়ির খবর কী?

—দূর, ও শালার সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে। বাড়ির কেউ আমার কথা ভাবে না আর আমিও গুষ্টির তুষ্টি করে দিয়েছি।

কোথায় যেন একটা ব্যথা। অশোক জানে দেবেনরা অনেকগুলো ভাই-বোন। দেবেনের ঠিক ওপরের বোনটা আত্মহত্যা করেছে। কেন ঠিক জানে না। সম্ভবতঃ প্রেমঘটিত কোন ব্যাপার। বাবার শেয়ালদায় বিরাট স্টেশনারী দোকান। দেবেনের মা'র সঙ্গে কারুরই মধুর সম্পর্ক নেই। বিচ্ছিরি খিট-খিটে মেজাজ। অশোক একদিন গিয়েছিল ওদের বাড়ি। দেবেনের বাপ আবার কংগ্রেসী। সাতষট্টির ভোটে যখন দেবেন সি. পি. এম.-এর হয়ে খাটছে, বাবা ওকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল। দেবেনের তখনকার একটা কথা এত ভয়াবহ লেগেছিল যে, আজও মনে আছে।

—বাপ শালা জন্মো দিয়েছে ভোগ করতে গিয়ে, আর খেতে থাকতে দেবে না মানে!

গোটা পারিবারিক পরিবেশটায় কোথাও একটু স্নেহ-ভালবাসা নেই মাঝে মাঝে দেবেনের জন্য কষ্টও হয়।

—তোর এলাকায় কিছু করতে পারবি?

—মানে, খতম?

—হ্যাঁ, স্কোয়াড হবে?

—আমি সাঁওতালদের মধ্যে তো সবে ঢুকতে পেরেছি। আর আমার এলাকার আসল শত্রুগুলো তো জানিস রাঘব বোয়াল।

—বেশি ভাবিস না। দু-তিনটে লোক জোগাড় করে শুরু কর। চারিদিকে কাটাকাটি শুরু হলেই দেখবি আলোড়ন হয়ে যাচ্ছে। দু-চারটে খতম হতেই দেখবি বাকিরা পালাচ্ছে। এলাকা শ্রেণীশত্রু-মুক্ত।

—আর পুলিশ-ক্যাম্প বসলে?

—আরে গেরিলা-যুদ্ধের আসল মজাটাই তো ওখানে। আমরা জানি শত্রু কোথায়, কিন্তু আমরা তো মোবাইল।

—কিন্তু জন-সমর্থনের প্রশ্ন আছে।

—আরে সমর্থন তো থাকবেই। শোষণমুক্তি কে না চায়, বল্!

মুক্ত এলাকা আজ হাতের সামনে এসে গেছে। মুক্ত শ্রীকাকুলাম, মুক্ত নকশালবাড়ি, মুসাহারি, লাখিমপুর খেরি। অশোকের মুক্ত ভারবর্ষে দেখতে, বেঁচে থাকতে বড় ইচ্ছে হয়। দুঃ, কী সব স্বার্থপরের মত চিন্তা! ওদের মত কত মানুষের আত্মত্যাগেই তো গড়ে উঠবে নতুন ভারত।

—সিনেমা যেতে ইচ্ছে করছে না।

—তা না যাস, ওঠ এখন।

দু'জনে উঠে পড়ে। কোর্টের ভীড় কমে গেছে। কতগুলো ঘেয়ো কুকুর এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে।

—নাঃ, যাই-ই, কী বলিস।

অশোক কোন উত্তর দেয় না। ওরা কোর্টের বাইরে চৌমাথায় এসে দাঁড়ায়।

—আচ্ছা, পরের মিটিং-এ দেখা হবে।

দেবেন চলে যায়। অশোক সিগারেট কেনে। তাড়াতাড়ি পা চালায়। মিনু এতক্ষণ এসে গেছে নিশ্চয়ই।

২০

—এই যে অশোকদা, আপনার একটা চিঠি রাজু দিয়ে গিয়েছিল ; একদম ভুলে গিয়েছি।

—কবে দিয়ে গিয়েছে ?

—সপ্তাহ খানেক আগে রাজু দিয়ে গেছে। কালকে মনেই পড়ে নি।

মিনু একটা বইয়ের ভেতর থেকে বার করে চিঠিটা দেয়। অশোক প্রথমে মা'র চিঠিটা পড়ে, তারপর বোন ছোটনের চিঠি পড়তে থাকে—

কমরেড দাদাভাই,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাই না। পুজোয় তোমার জন্য একটা জামা করেছি। গ্রামের জামা কেমন হয়, জানি না। অরুণদা বলেছিল, বুকে আর পাশে পকেট করতে। পাশে আবার কেমন পকেট ? জামার সামনের দিকে নীচে দুটো পকেট বসিয়ে দিয়েছি। এরকম জামা কলকাতার ছেলেদেরও পরতে দেখেছি। তোমাদের গ্রামের জামার স্টাইল কলকাতাতে চালু হয়ে গেছে। জামাটা ঠিক হয়েছে কিনা জানিও। তাড়াতাড়ি চিঠি দিও।

ছোটন

মিনু সামনে দাঁড়িয়ে দেখে, চিঠি পড়তে পড়তে অশোকের মুখটা হাসি হাসি হয়ে উঠছে। শেষে হো হো করে হেসে ওঠে অশোক। মিনু বুঝতে পারে না, কী ব্যাপার।

—আরে একটা জামা। চিঠিটা পড়ই না।

মিনু চিঠিটা পড়ছে আর অশোক বলে চলেছে—দেখো আমার ভগিনী শ্রীমতীর কীর্তি। মিনুর চিঠি পড়া শেষ হয়। দু'জনেই প্রাণ খুলে হাসতে থাকে। ছোটনের ছেলেমানুষীর নানা ঘটনা অশোক বলে আর মিনু মজা করে শোনে। মিনু যেন দেখতে পায় অশোকদের ছোট্ট সুন্দর পরিবারটা। মোটামুটি স্বাচ্ছল্য আছে, রোজকার বাজারে দু'পয়সা বেশী খরচ হল কি হল না হিসেব করতে হয় না। পরস্পরের মধ্যে মিষ্টি সম্পর্ক। অনেক সময় কেটে যায় গল্পে গল্পে। মিনুর খেয়াল হয়—এই যে কমরেড, রাতে কী উপোস নাকি ?

—আমার আপত্তি নেই। যদি

—যদি কী?

—যদি এরকম জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায়।

—না বাবা, আমি রাজি নই।

মিনু বেরিয়ে রান্না ঘরে যায়। অশোক বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। শরীরটা এখনও দুর্বল। কাল যাওয়ার পথে কালার সঙ্গে দেখা করতে হবে। স্কোয়াড কালার নেতৃত্বেই গড়তে হবে মনে হয়।

শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঢোকে মিনু।—কী হল, শরীর খারাপ লাগছে? অশোকের কপালে হাত দিয়ে দেখে।—গরম মনে হচ্ছে।

—উঁহু। ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে এসে দেখলে যেকোন লোকেরই জ্বর জ্বর লাগবে।

—রাতে ভাত খাওয়া ঠিক হবে?

—আলবৎ ঠিক হবে।

—আর বীরত্ব দেখাবেন না। ক'দিন ভিজেই তো কুপোকাৎ। জানেন অশোকদা, বীরত্বের কথায় মনে পড়ল। সেদিন আমার যা অবস্থা না।

—কিসে?

—আরে আমরা দুটো মেয়ে সেই ওল্ড মালদা থেকে বোমের মশলা নিয়ে এসেছি। যা ভয় করছিল না। সব সময় মনে হচ্ছিল, বুঝি এই ফাটল।

—দূর, আলাদা আলাদা লাল সাদা ফাটে নাকি।

অশোকের মনে হয়, বোমা বাঁধাটা শিখে আসা উচিত ছিল। বোমা ধরেছে ও। কিন্তু কোনদিন বাঁধেও নি, ছোঁড়েও নি। মিনু এতসব কাজ করছে।

—শহরে আমাদের রাজনীতি করে এমন মেয়ে ক'জন?

—জনা সাতেক। কলেজে চেষ্টা করছি আমরা। আর আমাদের রান্না-ঘরের পেছনে যে দর্জি-বাড়িটা, ও-বাড়ির বৌদিকে টানতে চেষ্টা করছি।

অশোক একটা একাত্মতা অনুভব করে। ওদের লক্ষ্য এক। বাঁশির মত নাক, হরিণের মত চাহনী নয়—এরা যেন ভিয়েতনামের মেয়ে গেরিলা। ছবি দেখেছে অশোক—সেই ছবি থেকে যেন মাথার পাতালাগানো হেলমেট খুলে কাঁধের রাইফেলটা নামিয়ে রেখে জীবন্ত হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে।

—চুপ কেন?

—না, এমনি।

অশোকের মনে হয়, এরা কি জানে যে গ্রেপ্তার হতে পারে? ভিয়েতনামের মেয়েদের ওপর আমেরিকান সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচার আর নাগা মেয়েদের ইজ্জত ভারতীয় সৈন্যের বুটের তলায় কীভাবে ধর্ষিত হচ্ছে? এই নিষ্পাপ মেয়েগুলোও আমাদের মত নতুন দুনিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

—তোমাদের ভয় করে না?

—ভয়ের কথা ভাবি না। আমাদের চারপাশের এত লোকে যা করছে তাতে ভয় পাবো কেন?

অশোকের সংকোচ হয়, ও কোথায় আরো উৎসাহ দেবে, তা নয়!

—অশোকদা, এই ছকে-বাঁধা জীবন আর ভাল লাগছে না। বেশ আপনাদের মত গ্রামে চলে যেতাম।

সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ভেতরের আলোড়নের ধাক্কা খাচ্ছে অশোক। —যাবে তো নিশ্চয়ই। আরেকটু সময় দাও আমাদের।

—কেন, গ্রামে কী মেয়েরা থাকে না?

—থাকে। কিন্তু এই পর্যায়ে পার্টি-কর্মী মেয়ে? আমি ঠিক ভাবতে পারছি না। তুমি কী সত্যিই ভাবছো? তাহলে জহরের সঙ্গে কথা বলবো।

—ঠিক জানি না। আমার অনেক কিছুই করতে ইচ্ছে করে। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, অশোকদা।

—শহরেও তো অনেক কাজ আছে। কলেজ ভাল না লাগলে ছেড়ে দাও।

—ছেড়ে তো দিতে চাই। ঋণের বোঝা বাড়ছে শুধু শুধু। আবার ভাবি বাড়িতে বসে থেকে লাভ। তবু তো কলেজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছু কাজের সুযোগ পাচ্ছি।

—সত্যিই মুশকিল। এত ছোট শহরের মধ্যবিত্ত মেয়েদের বস্তিতে কাজ করাটা সম্ভব হবে না বোধ হয়।

মিনু ভাবে, দীপুকে পরিষ্কার জানিয়ে দেবে। অসম্ভব, শুধু খাওয়ানোর আর শোবার জন্য জীবনসঙ্গী হবে একজন, ভাবতে পারে না মিনু।

—মিনু, ঋণ বাড়ানো মানে? ঠিক বুঝলাম না!

—না। ওই মা'র অসুখ। মানে বাবা তো আর পড়াতে পারবে না, বলেছিলেন। তখন···

অশোক দেখতে পায় মিনুর মুখে একটা অসহায়তার কালোমেঘের ছায়া।

—তখন আমাদের পরিচিত একজন আমার পড়ার খরচের দায়িত্ব নেয়।

—কলেজেও ?

—হ্যাঁ, দীপুই। নামটা বলে ফেলেই সংকুচিত হয়ে পড়ে মিনু। অশোকের মনে হয়, কার কাছে যেন শুনেছিল—মিনুদের বাড়ি শেল্টার নিচ্ছিস, দেখিস ঝুঁকিস না যেন। খুঁটিতে বাঁধা আছে।

—কিছু যদি মনে না করো তো একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

—কী এমন কথা ? মিনু দৃঢ়তা ফিরে পেয়েছে।

—এই দীপুকে কী তুমি ভালবাসো ?

—সে অতীতের ব্যাপাব।

—অতীত কেন ? একটা মানুষের মনে আঘাত দিচ্ছ ?

—ও আমাব জন্য অনেক করেছে। আমি সত্যিই ওর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন আর মানিয়ে নিতে পারছি না।

অশোক স্থির চোখে মিনুকে দেখে। মিনু দু'হাতের মাঝে শাড়িব আঁচল ভাঁজ কবতে ব্যস্ত। ও ঘর থেকে মিণ্টু-সন্তর পড়ার শব্দ আসছে।

—দীপুকে জানিয়েছো ?

—না, পরিষ্কার করে বলা হয় নি। ঠিক কীভাবে বলবো, বুঝতে পাবছি না। অশোকদা, জন্তুদের মত জীবন মেনে নিতে পাববো না। অন্যান্য মধ্যবিত্তদের মত ওপরে ওঠায় আস্থা নেই। আমি সামনে এগোনোব পথেব খোঁজ পেয়েছি, আব দীপুব বিশ্বাস সামনে এগোনোব কোন পথ নেই। এমনকি ওপরে ওঠার কথাও ও ভাবে না। ওব কাছে সারা পৃথিবী থেমে গেছে। ও বর্তমানেব সবকিছুই মেনে নিয়েছে। কোন বদলাবার চেষ্টা নয়, শুধু ক্ষিধে মেটানো। না না, তা আব হয় না।

মিনু তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘবে চলে যায়। ছিঃ, আবেগের বশে যে কত কথাই বলে ফেলেছে। লজ্জা চাপতে কাজে বেশী ব্যস্ত হতে চেষ্টা করে।

২১

রবিবারের দুপুর। মিনুর তোষকের নীচে রাজুর আজকের দিয়ে-যাওয়া পার্টি-পত্রিকাটা পড়ে আছে। একটু শীত শীত লাগছে। উঠে একটা চাদর এনে জড়িয়ে শোয়। বাবা বাড়িতে, তাই কাগজটা বার করে পড়তে পারছে না। সকালে শুধু সামনের পাতার হেডলাইনটা পড়েছিল—বহরাগড়ায় আর একজন জোতদার খতম—পুলিশীসন্ত্রাসের মধ্যে গেরিলাযুদ্ধ অব্যাহত। অশোক তো বলেছিল, আমাদের এখানেও শুরু হবে। এখনও তো কোন খবর শোনে নি। রাজু তো বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলল যে, এতগুলো জেলায় এত খতম হয়ে গেল, আমাদের গ্রামের কমরেডরা যে কী করছেন?

—মিনু, আজ বিকেলেও তোকে পড়াতে যেতে হবে?

—না, বাবা।

বাবাকে চৌকিতে বসতে দেখে মিনু বোঝে যে কিছু বলতে চায় বাবা।

—তোর মা'র শরীরটাতো আবার খারাপের দিকে। হাঁপানির টান ছাড়াও বলছে সেই সেবারের মত হচ্ছে। কী যে করা যায়।

অসহায় মানুষের দিশেহারা গোঙানির মত শোনায় কথাগুলো।

—পয়সা নেই হাতে একদম। সব জায়গা থেকেই তো ধার করেছি। আবার এ-ধাক্কায় কোথায় টাকা পাই বল তো।

দুজনেই চুপ কিছুক্ষণ। এ-সমস্যায় মিনুর কিছু করার নেই।

—মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয়, জানিস রে মা। একটু থেমে দম নিয়ে গলার স্বর নীচু করে হঠাৎই বলে ফেলেন—এর চেয়ে তোর মায়ের মরণও ভাল ছিল। নিজেরও কষ্ট, বাড়ির লোকেরও কষ্ট।

মিনু প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করে যায়। ওর নিজেরও যে কখনও কখনও এ-কথাই মনে হয়। কবে যে মুক্তি হবে, সেদিন আর কতদূর! অশোক তো বলছিল সত্তর দশকের মধ্যেই। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু কেন যেন ভরসা পায় না।

—তোর বড় চাপ পড়ছে না রে?

মিনু বোঝে বাবার একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। দুটো মেয়ে পড়িয়ে তিরিশ টাকা রোজগার মিনুর। কলেজের মাইনে দিয়ে বাড়তিটুকু বাবার

হাতে তুলে দেয়। বাবার মর্যাদায় লাগে অথচ বলতে পারে না ওটা তোর হাত-খরচ থাক।

—এতসব ভাবছো কেন? আগে আড্ডা দিতাম, এখন সে সময়টা ছাত্রী পড়াচ্ছি।

—দীপু আসে না কেন রে?

—আমি কী করে বলবো?

নিবারণবাবু বোঝেন এ-ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে চায় না মিনু। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। দীপুর সঙ্গে মেয়েটার বনলো না? এতদিন পরে! খুব হতাশ হয়ে পড়েন। হাজার হলেও বাবা হিসেবে মেয়েকে পাত্রস্থ করার একটা কর্তব্য আছে। দীপুকে ভেবে নিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধি করে একটা ভাল ছেলেটেলেও যদি ধরতে পারতো মেয়েটা। দীপুকেও দূরে ঠেলে দিল। তবে কি সুজিত? দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ান।

—সুজিতকেও তো দেখি না। অনেক দিন আসে না। শরীরটরীর খারাপ হয় নি তো?

স্বরে একটা করুণ আকুতি, যেন সুজিতের সঙ্গে পার হবার ইঙ্গিত দিয়ে বুড়ো বাপটাকে নিশ্চিন্ত কর।

—বিদেশ বিভূঁয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে একা থাকে, একটু খোঁজ খবর নিলেও তো পারিস।

—সুজিতদা ভাল আছেন।

মিনু বাবার জেরার হাত থেকে মুক্তি পেতে হাতের কাছের একটা বই টেনে খুলে ধরে। নিবারণবাবুর অবাক লাগে, আগে মেয়েটা পড়তেই চাইতো না। এখন দিনরাত যে কী ছাইভস্ম পড়ে! ধীর পায়ে নিজের ঘরে চলে যান।

মিনু বই বন্ধ করে চুপ করে হাতের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে। বাবা এত সুজিত সুজিত করছে কেন? সুজিতদার কিন্তু একটু কেমন যেন মনে হচ্ছে। সেদিন তো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলল। মিনু সুজিতের কাছে গিয়েছিল কালেকশনের টাকা আনতে। শহরের ছেলেরা এখন আর পরিচিত জায়গাগুলোতে ঘোরাফেরা করতে পারে না। পর পর দুটো ঘটনা ঘটেছে, তাই সাবধান থাকতে হচ্ছিল ওদের। কালীপুজোর সময় ওরা পোস্টার একজিবিশন করেছিল। নরেশ নাকি কংগ্রেস জনসঙ্ঘের বেশ কিছু কর্মীকে

নিজেদের সঙ্গে আনতে পেরেছিল। তারাও মেহনতী ঘরের ছেলে, কাজেই ধৈর্য ধরে অনেকদিনের চেষ্টার পর তারাও পুরোনো পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। জনসঙ্ঘের নেতারা বুঝেছিল, শত্রুতার সম্পর্ক না তৈরি করলে একটা ক্যাডারও টি'কবে না। পোস্টার একজিবিশনের ওপর আক্রমণ করে, মারামারি হয়। তারপর থেকেই এই ব্যবস্থা হয়েছে যে, শহরের ভেতরে পরিচিত যোগাযোগ মেয়েরা রক্ষা করবে। সেদিন মিনু যেতেই সুজিত অবাক। যেন ভাবতে পারে নি মিনু, কোনদিন মেসে যাবে।

—আরে, এস এস।

মিনু সিঁড়িব থেকে বারান্দায় উঠেই শুনতে পেয়েছিল সুজিতের বন্ধু বলছে —এ-সময়ে জ্বালিয়ে তোর শত্রু হব নাকি? সুজিতের চোখে বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটে নি।

—তুমি!

—অনেকদিন যান না, তাই খবর নিতে এলাম।

—যাক, ঘরেতে এলো না সে তো, এ-দুঃখ আর করা চলবে না। চা খাবে?

—না, কাজ আছে।

—হুকুম করো।

মিনুর সংকোচ হচ্ছে, পার্টির কাজে এসেছে তবু টাকা চাওয়া ব্যাপারটায় যেন আটকাচ্ছে।—সুজিতদা, নরেশদা কালেকশনের টাকাটা দিতে বলেছে। মিনু লক্ষ্য করে, সুজিতের উচ্ছ্বাসটা দমে যায়।

অশোকের আসতে এখনও কত দেরী! পত্রিকাটা বার করে পড়বে নাকি, ভাবে মিনু। না থাক, হঠাৎ বাবা এসে পড়তে পারে। মিনুর নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগে। কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেল। অশোককে পরেশেরও খুব ভাল লেগেছে। পরেশ এখন পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়। প্রথমদিন শুনে যদিও হেসেছিল, তারপর ধীরে ধীরে মিনু পরেশকে ঠিক বোঝাতে পেরেছে। এখন তো ওদের ট্রাক শিলিগুড়ির দিকে গেলেই পরেশ জহরদার কাছ থেকে চিঠি-কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে ওখানে পৌঁছে দেয়। মিনু নিজের এনার্জি দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়। আগে সবসময় বিরক্ত লাগত আর ক্লান্ত লাগত। সাহসও বেড়ে গেছে। সেই চীনবিরোধী 'শতরঞ্জ' আনার জন্য চিত্রা সিনেমায় যেদিন অ্যাকশন হল। মিনু আগে কোনদিন ভাবতে পারতো না, এরকম একটা ব্যাপার আর ও নিজে তাতে অংশীদার।

বোমা ফাটল, পর্দায় আগুন জ্বলল। ওরা ক'জন মেয়ে মেয়ে-দর্শকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের ভয় ভেঙ্গে হলের বাইরে নিয়ে আসে। পুলিশ আসে—ততক্ষণে সবাই কেটে পড়েছে।

কিন্তু নরেশদা এখনও ছাড়া পায় নি। শতরঞ্জ অ্যাকশনের পরের দিন মিনু, কেয়া আর ভারতী ভারতীদের বাড়িতে বসে। অ্যাকশন নিয়েই ওদের আলোচনা হচ্ছিল। দরজায় হঠাৎ সাইকেলের বেল। হাঁপাতে হাঁপাতে রাজু ঢোকে।

—কী রে? কী হয়েছে?

—নরেশদা অ্যারেস্টেড।

কেয়া নরেশের একটা পুরোনো ডায়েরির পাতা উল্টে দেখছিল। সেটা রেখে খাটের ওপর বসে পড়ে। ভারতী ঘরের দরজা ভেজিয়ে এসে কেয়ার পাশে বসে—বড়দা আসার আগে যেন মা র কানে না যায়।

কেয়া চুপ। মিনুরও এ একদম অচেনা পরিস্থিতি। ভারতী জিজ্ঞেস করে রাজুকে—কখন? কোত্থেকে?

—স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কালাচাঁদদার বাড়ি থেকে। আজ ভোর রাতে।

সবাই আবার চুপ। ঘরের মধ্যে একটা বোলতা ঢুকে পড়েছে। বোঁ বোঁ বোঁ করে এদিক ওদিক ঘুরছে। রাজু দাঁড়িয়ে সাইকেলের চাবি দিয়ে নখ খুঁটছে।

—গোবিন্দদাকে খবর দিতে হবে। ওর শেল্টার কে চেনে?

—কেয়া চেনে। ভারতী বলে।

—জলদি খবর দেওয়া দরকার। গোবিন্দদাকে অন্য শেল্টারে যেতে বলিস আর কী কী করতে হবে, জেনে আসিস। আমি চলি, অনেকগুলো কাজ আছে।

রাজু বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে ভারতী। কেয়ার পাশে বসে কেয়ার মুখটা তুলে ধরে। মিনু খেয়ালই করে নি। কেয়ার চোখের কোণে জল টলটল করছে।

—এই বোকা মেয়ে।

নিজেকে আর সামলাতে পারে না কেয়া। ভারতীর কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মিনু বোকার মত প্রশ্ন করেছিল ভারতীকে—নরেশদাকে ওরা মেরে ফেলবে? কেয়ার জন্য ব্যাথায় মনটা ভরে গিয়েছিল। ও আগে জানতো না। তখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কেয়া নরেশদাকে ভালবাসে।

আচ্ছা যদি অশোক ধরা পড়ে, কেমন লাগবে? গ্রামের কমরেডদের ধরলে নাকি কোনদিন ছাড়ে না। সুজিতদা বেশ আছে, বিপ্লবের জন্য কাজও করছে খানিকটা অথচ ধরা পড়ার ভয় খুব একটা নেই। অশোক যদি সুজিতদার মত জীবন কাটায়! নাঃ, অশোক পেছুবে কেন? এগোতে কী ভয় পাচ্ছি? মিনুর মনে হয়, অশোকের পাশে দাঁড়াতে গেলে কোন ভয়, কোন পেছুটান থাকলে চলবে না। আমি কি পারবো? আমিও বিপ্লব চাই, কিন্তু অশোকদের মত করে চাইতে পারছি কি? অতটা এগোতে যদি না পারি? মনের জোরে যদি কম পড়ে? দীপু নিশ্চিন্ত সংসার দিতে পারে। কিন্তু ওতেই ও ফুরিয়ে যায়। অশোক কোন নিশ্চিন্ততা দিতে পারবে না। অশোকদের মত চরম অনিশ্চয়তার জীবন ভাবতে পারছি কই! অথচ দুনিয়া বদলানোর জন্য কিছু না করার কথাও ভাবতে পারছি না। তবে কি সুজিতদা? অশোকের জন্য অনেক কিছু করবো। নিজেরা কষ্ট করেও ওদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো, পাশে দাঁড়াবো। অশোক আমার ভয় হচ্ছে, আমি বোধ হয় তাল ফেলে চলতে পারবো না। কেয়া কি অদ্ভুত! সেদিন একটু বাদেই চোখের জল মুছে উঠে পড়ল।

—গোবিন্দদাকে খবর দিতে হবে। ভারতী বলেছিল দাঁড়া, তুই একা যাস না।

—না, সঙ্গে যেতে হবে না। আদেশের সুর কেয়ার গলায়।—বাড়িতে থাক। খোকাদা এলে বলিস, উকিলের দরকার হলে যেন মাধব সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নরেশ আমাকে বলে রেখেছিল, উনি আমাদের সমর্থক।

বিস্ময়ের চোখে তাকিয়েছিল মিনু। চোখের জল ফেলার সময় কোথায়, এখনো যে অনেক কাজ বাকি।

একসঙ্গে বেরিয়েছিল দু'জনে। কথা বলতে ভরসা পাচ্ছিল না মিনু। কেয়াই বলেছিল—আমরা বড় দুর্বল রে। একটুতেই ভেঙ্গে পড়ি। মিনু চুরি করে করে তাকিয়েছিল কেয়ার দিকে। কোথাও বেদনার ছায়ামাত্র নেই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ওর প্রতিটি পদক্ষেপে। কেয়া কোথা থেকে এত জোর পাচ্ছে? রাজনীতি থেকে, না ভালবাসা থেকে?

এদিকে বিকেল হয়েছে। নাড়ু-সন্তু-খোকন খেলতে বেরিয়েছে। দীনবন্ধুর দোকানে বয়স্ক লোকেদের বিকেলে একটু আড্ডা হয়। মিনুর হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাড়িতে চা শেষ হয়ে গেছে।

মিন্নু উবুর হয়ে দু'হাতের ওপর মাথা রেখে বইয়ের পাতায় চোখ মেলে, লাইনগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। ভাবতে চাইছে না ও, কিন্তু মাথার মধ্যে যেন ভীমরুলের চাক ভেঙ্গে গেছে। দীপু? না, দীপু অসম্ভব। অশোক, না সুজিত? ভাবতে পারছে না মিন্নু। পাগল পাগল লাগছে। কিসের তাড়া খেয়ে যেন ছুটে ওঘরে পালায়। মা'র পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মিন্নুর মা'র তন্দ্রা ভাবটা কেটে যায়। মেয়ে মাকে আঁকড়ে ধরেছে, যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে। মা আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

২২

পাচজন হাঁপাতে হাঁপাতে টিলা মত জায়গাটায় উঠে দাঁড়ায়। সামনে পিটিয়ে-মারা সাপের মত পড়ে আছে ডোকলা নদী। একটা গরুর গাড়ি নদীর ওপারে খাড়াইটায় উঠছে। বাবু মত একজন লোক গাড়িতে বসে। গাড়োয়ান বলদের লেজ ধরে কষে মোচড় দিচ্ছে। গাড়িটা খাড়াইয়ে উঠতে পারছে না। সামনের দু'জন পথচারীকে বাবু ডাকে বোধ হয়। তরো এসে হাত লাগায়—গাড়ির চাকা ধরে ঠেলে এগিয়ে দেয়।

ফকরুদ্দিন জহরের দিকে চায়—একটুকুন আগে খবর পেলে এখনি হই যেত। টুডু একদৃষ্টে দূরে গাড়িটার যাওয়ার দিকে চেয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে বলে—এপারকে ঠিক হবে নাই। উদিকে চ।

ওরা এগোতে থাকে। টুডু স্কোয়াডের নেতা। নির্দেশ মানতেই হবে। অনেকটা এগিয়ে দাঁড়ায় টুডু। সিধে রাস্তা অনেকদূর অব্দি দেখা যাচ্ছে। শেষ মাথায় একটা গ্রাম পারিয়াল। চারধারের জমি ন্যাংটো। ধান কাটা হয়ে গেছে। বাঁ হাতে একটা বড় পুকুর। পুকুরটাকে ঘিরে অনেক তালগাছ মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। পুকুরপারে রাস্তার ধার ঘেঁষে কুল, আকন্দ, ছোট খেজুর আর কুটুসে মিলে ঘন আড়াল তৈরি করেছে। টুডু এগিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে যায়।

—ইদিকে আয়।

সবাই ঝোপের আড়ালে চলে যায়। জহর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে। বাকি সবাই বসে পড়ে। এর ওর চাদরের নীচ থেকে একটা কাস্তে একটা

ছোরা আর একটা ছুঁচলো লোহার রড বেরিয়ে আসে।—তুরটা দেখি রে, কমরেড।

জহর ওর চাদরের নীচ থেকে হাত আর বুকের মাঝে চাপা কাস্তেটা বার করে দেয়। তারপর এক পাশে একটা তালগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পারিয়ালের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। গরুর গাড়িটা ফিরবে। অনাদি রায় ফিরবে সেই গাড়িতে। অনেকদিন ধরে পাত্তা লাগাচ্ছে। এত ভাল সুযোগ আর পায় নি। সেই অনাদি রায়, যৌবনে যার অত্যাচারে এলাকার অন্ততঃ চারটে মেয়ে হয় গলায় দড়ি দিয়েছে, নয়ত ডুবে মরেছে। আরও কত কাহিনী চাপা থেকেছে। বেশীদিন নয়, বছর কয়েক আগের কথা—ওর বাড়িতে চাকরের কাজ করত বছর পনেরোর সাঁওতাল ছেলে—সুক্কা। একদিন তার আর হদিশ পাওয়া গেল না। গাঁয়ের মানুষের স্থির বিশ্বাস মরে গেছে ছেলেটা। অনাদি রায় কারণে অকারণে চাকর পাঁইটদের পিটত। সুক্কাকেও পিটিয়েই মেরে ফেলেছে। তারপর টাঙ্গনের জলে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে। ভাসতে ভাসতে পাকিস্থান চলে গেছে। তাই লাশটাও আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। পয়সার পিশাচ লোকটা। বর্ষায় এক মণ ধান ধার দিয়ে নতুন ধান উঠলে আড়াই মণ তিন মণ পর্যন্ত আদায় নেয়। বাপের উপযুক্ত বেটা। বাপ লণ্ঠন আর নুন বেচতে এসে সরল সাঁওতালদের জমি কব্জা করেছিল। আর বেটা পাঁইট মুনিষদের বেগার খাটিয়ে নিজের সিন্দুক ভরছে। লোকটা আজ মরবে। নিশ্চিন্তে ধান আনতে গেছে পারিয়ালের খামারবাড়ি থেকে। ও কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে, রাস্তার ধারে ওর জন্য যমেরা অপেক্ষা করছে। ভারি ভাল লাগে জহরের। সামনে বসে থাকা সাথীদের দিকে চায়। পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। শেষ লাল আলোয় সারা আকাশ জুড়ে রক্তের বান ডেকেছে। অনেক অত্যাচার সয়েছে মানুষ। এবার চলবে অত্যাচারের উল্টোরথ। ডান হাতের জমিটায় কাটা ধানগাছের গোড়া থেকে আবার সবুজ পাতা উঁকি দিচ্ছে। আলের সার বেঁধে অনেক ছোট বড় ইঁদুরের গর্ত হাঁ করে আছে। টুডু উঠে এসে জহরের পাশে দাঁড়ায়।—নজর রাইখছিস তো?

জহরের নজরের ওপর যেন পুরো নির্ভর করতে পারছে না। টুডু নিজেই পারিয়ালের পথে গরুর গাড়ি খুঁজতে থাকে। ওর সারা মুখে আকাশের লাল রঙের ছোপ, ভয়ডরহীন দৃপ্ত শপথ। অনেকদিন ধরে দেখেছে জহর, কোন কিছুতে পেছ-পা হয় নি। খতমের লাইনের কথা শুনে টুডু বলেছিল—কায়দাটা

ভাল, কিন্তু ক'জনে আর একাজে পার্টির সঙ্গে আসবে। কিন্তু তাই বলে নিজের উদ্যোগে ঘাটতি পড়ে নি। টুডুর মত দু'চারজনকে দেখেই জনগণের বিশ্বাস বাড়ে জহরের। জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে কৃষক-বিদ্রোহে সঙ্গী ছিল জিতুর জেঠা। লড়তে লড়তে মরেছিল, গর্ব করে বলে টুডু। রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে জহর নিজেকে এগিয়ে থাকা ভাবে। সামবিক সাহসও যদি কৃষকদের চেয়ে নিজের বেশী মনে হয়, তবে কি কৃষকদের ওপর আস্থা থাকে? কত ধরণের কথাই শুনতে হয়েছে এই স্কোয়াড তৈরি করতে গিয়ে। রাত্ত ছাড়া খতম করা যায় না, চাঁদের আলোয় কেউ চিনে ফেলতে পাবে, পুলিশের কুকুর এলে তো ধরা পড়ে যাবো। কৃষকদেবই কথা। শুধু মধ্য-কৃষকেরা নয়, প্রচারের কাজে এগিয়েছে, অনেক অসুবিধেব সম্মুখীন হয়েও বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে এমন ক্ষেত-মজুর আর গরীব চাষীদেব অনেকের মুখেই এ-কথা শুনে হতাশা এসেছে। কয়েকজন মধ্যবিত্ত মিলেই অ্যাকশন করতে হবে, এ-ধরণের চিন্তা এসেছে কারুর কারুর মাথায়। কিন্তু টুডু, ফকরুদ্দীন এবা হতাশা কাটিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেবী হয়েছে, আরও বেশী সময় দিতে হয়েছে। অনেক আত্মানুসন্ধান করেছে জহব—চারপাশের মধ্যবিত্ত কমরেডদেব লক্ষ্য করেছে। অনেকেরই তাড়াহুড়ো করে কলকাতার হাততালি পাওয়াব তীব্র আগ্রহ কাজ করছে।

টুডু একদৃষ্টে রাস্তাব দিকে চেয়ে আছে। জহর টুডুব হাত ধরে নাড়া দেয়।—একটা বিড়ি ধরাবো?

টুডু জানে, বেশীক্ষণ বিড়ি না খেয়ে থাকতে পারে না ওর কমরেড। খেতে না পাক মুখে রা-টি কাড়বে না। কিন্তু বিড়ি না হলেই মুশকিল।—ঝটছি টেনে লে। বিড়ি ধরায় জহর। তালকা টুডুকে ডাকে। আস্তে কী যেন বলে, শুনতে পায় না জহর। টুডু রাগত স্বরে জোরেই উত্তর দেয়—ডর লাগে তো ঘরকে যা।

জহরের কাছে এখনও ঠিক পরিষ্কার নয়—খতম হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের সর্বোচ্চ কাজ। অল্প ক'জনই একাজে এগিয়ে আসছে। যারা এতটা এগোতে চাইছে না, তারা কী করবে? খতমকে আমরা শ্রেণী-সংগ্রামের শুধু সর্বোচ্চ নয়, একমাত্র কাজ হিসেবে ঠিক করেছি। ষড়যন্ত্রমূলক কায়দায় স্কোয়াড তৈবি করছি—পাঁচ ছ'জনকে নিয়ে। অনেক কৃষক আসছে আমাদের কাছে। কিন্তু নিজেরা খতমে থাকতে চাইছে না। এদের করার মত কোন কাজ আমরা

দিতে পারছি না। পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া কী করে গুণগত পরিবর্তন হবে? পার্টি বলতে এই স্কোয়াডই। অনেকেই এগোচ্ছে না তাদের শ্রেণীর উদ্যোগ দেখছে না বলে। অথচ শ্রেণীকে সংগঠিত করতে গেলে, উদ্যোগ বাড়াতে হলে সংগঠনের রূপ শুধু ষড়যন্ত্রমূলক হলে চলে না। বিড়ির টুকরোটা জলে ছুঁড়ে দেয় জহর। মৃদু একটা ঢেউ ওঠে। তারপর বিশাল নিশ্চলতার মধ্যে হারিয়ে যায়। জল আগের মতই স্থির থাকে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। জহর গিয়ে তালকার পাশে বসে। তালকা জহরকে বলে—কার হাতে কুন হাতিয়ার থাকবে ঠিক কইরে লে। জহর টুডুর দিকে চায়। টুডু জহর আর ফকরুদ্দিনকে দুটো কাস্তে এগিয়ে দেয়। ছোরাটা নিজের জন্য রেখে লখনার দিকে লোহার রডটা এগিয়ে দেয়। তালকাকে বলে—তুই পাইটটাকে ভাগায়ে বৈল দুইটা সামলাস। গাড়ি সামনে পঁহুচালেই আমার দিকে নজর করবি। আমার সঙ্গে সব্বাই ঝাঁপায়ে পড়বি। তালকা, তুই বলদ ধরিস ঠিকসে, নাইতো গাড়ি লিয়ে ইদিক উদিক ছুইটবে। হঠাৎ, হঠাৎই গ্রামের চৌকিদারের রাত পাহারার ডাক জহরের কানে বেজে ওঠে—হুঁ-শি য়া-র হো হে হো—হেইহো—। একটু যেন বুক দুরু দুরু করে ওঠে। টুডু স্থির চোখে পারিয়ালের দিকে চেয়ে আছে। ফকরুদ্দিন উদ্বেগের স্বরে টুডুকে শুধায়—উদিককার হাঁটা রাস্তায় না চইলে যায়। টুডু জিজ্ঞেস করে লখনা তু ঠিইক দেইখেছিলি?—হাঁ। টুডু মনে মনে হিসেব করে, বাবু গিছে গাড়ি লিয়ে ধান আইনতে। রাইতে কুতুদ্দিন উন্যু গাঁয়ে থাকে নাকো। ইদিক হয়ে ফিরতে হবেকই। আগে যদি লাঠাইত পাঠায়ে থাকে? দুঃশ্চিন্তা হয় টুডুর। গাড়ি ধানে বোঝাই কইরে ইদিক দিয়ে পাঠিয়ে লিজে লাঠাইত লিয়ে উদিক দিয়ে ফিইরতে পারে।—লখনা একনা আগিয়ে দেখ তো। গাড়ি আইসতে দেইখলে জলদি আইসবি।

লখনা উঠে এগিয়ে যায়। ডোকলার দিক থেকে দুটো লোক আসছে। টুডু বসে পড়ে সবাইকে চুপ থাকতে বলে। টুডু ভাবতে থাকে, খানিক ভাঁটিতে ডোকলা পার হয়ে গ্রামে ফেরার হাঁটা পথ। আজ তো আবার নারানপুরের হাট। অনেক লোক ফিরবে। সামনে দিয়ে লোক দুটো চলে যায়। অজানা ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে জহরের। টুডুর দিকে চায় জহর। টুডু আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকার চেপে বসছে। টুডু যেন অন্ধকারের সব বেড়া ভেঙে গাড়িটাকে দেখবেই। জহর টুডুকে দেখে সাহস পেতে চাইছে। ফকরুদ্দিনের

চোখ দুটো জলজল করছে, যেন এত দেরী ওর সহ্য হচ্ছে না। তালকা মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে। প্রথম শীতের মেঘমুক্ত আকাশ জুড়ে তারার হাট বসেছে। জহর গুনগুন করে—

কিসের ভয় / সাহসী মন লালফৌজের
লাফিযে হই পার।
থাক না হাজার অযুত বাধা / দীর্ঘ
দূর যাত্রায

জহর ঠিক পুরোটা ভাবতে পারে না। তবু ওর ভাবতে ভাল লাগে, উত্তরবঙ্গের এই বিস্তীর্ণ সমতল জুড়ে বিরাট এক লড়াই হবে। বহু এলাকায লালবাজ কাযেম হবে। তারপর হয়ত শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে সাময়িক ভাবে সরে যেতে হবে নেপালের ধার ঘেঁষে, তরাইয়ে। বিভিন্ন আশপাশের এলাকার মিলিত শক্তি নিয়ে তৈরি হবে লালফৌজ। তারপর উত্তর থেকে জয করতে করতে আবার ফিরে আসবে এসব এলাকা। দক্ষিণ বাংলা, বিহারেও লড়াই এগোচ্ছে। হয়ত ওদিকটাও মুক্ত হবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রচণ্ডভাবে জড়িযে আছে ও অঞ্চলে। তাই শেষ সম্বল উজাড করেও শত্রুরা কব্জায রাখতে চাইবে। শত্রুর দুর্বল এলাকাগুলোই তো আগে মুক্ত করতে পারবো আমরা। আর শ্রীকাকুলাম, পাঞ্জাব, মুশাহারী—সারা ভারত জুড়ে লড়াই গড়ে উঠছে।

—লখনা আইসছে।

টুডু যেন প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। দূর থেকে গরুর গাড়ির চাকার একটানা গোঙানির ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ আসছে। দেখা যাচ্ছে না গাড়িটা। টুডু দাঁড়িযে আছে। সারা পৃথিবীতে ওই গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। টুডু বসে পড়ে ছোরাটা হাতে নেয়। জহর আর ফকরুদ্দিন কাস্তে কষে ধরে। গাড়ির সাদা বলদ দুটো দেখা যাচ্ছে। টুডু ফিসফিস করে বলে—আমি বুললেই ···। একটু ঝুঁকে কুটুসের ঝাড় ফাঁক করে চেয়ে আছে টুডু। গাড়োয়ানের পেছনটা দেখা যাচ্ছে না। টুডু ঘাড় ফেরায়।—গাড়ি চালায় যে মুনিষটা, উয়ারে কিছু করিস নাই। বাধা দিলে জখম করিস, জানে মারিস নাকো।

টুডুর শেষ নির্দেশ। পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

এসে পড়েছে গাড়িটা। একদম সামনে। গাছের ফাঁক দিয়ে ঘুরন্ত চাকাটা দেখা যাচ্ছে। ওরা শুধু টুডুর আদেশের প্রতীক্ষায়। কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে টুডু। ভয়ে আর উত্তেজনায় তালকার হাত-পা অসাড়। জহরের হাতের চেটো ঘামছে। টুডু অত কী দেখছে? গাড়ীটা যে বেরিয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে গেল ওদের।—লক করে বইসে থাক। নাই দুইটা মুনিষ।

ওরা পাঁচজনেই কুটুসের ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ফকরুদ্দিন বিরক্তির চোটে কাস্তের কোপে কয়েকটা আকন্দ গাছই কেটে ফেলে। লখনা লোহার রডটা মাটিতে গাঁথতে গাঁথতে হাঁটছে। জহর বিড়ি ধরায়। তালকা ভয় পেয়েছিল বলে লজ্জায় মাথা সোজা করে হাঁটতে পারছে না। টুডু হেসে বলে —কুনু মনেব সাধ অপূর্ণ ছিল শালর। ভগ্‌মান পবমায়ু ক'দিন বাড়ায়ে দিলেক।

২৩

রেল লাইন পেরিয়ে রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ডানদিকে অনেকটা দূরে স্টেশন প্ল্যাটফরম দেখা যাচ্ছে। শহরের কোলাহল পেছনে ফেলে ওরা দু'জনে এগিয়ে যায়। সামনেই এরোড্রাম কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ছিঁড়ে উপড়ে ফেলতে পারে নি, কিন্তু টেনে নীচে নামিয়ে মানুষ ঠিক পথ করে নিয়েছে। অশোক পার হয়ে যায়। মিনু দাঁড়িয়ে ভাবছে, শাড়ি আটকে যাবে কিনা। অশোক হাত বাড়িয়ে দেয়। বলিষ্ঠ হাতটার ওপর ভর দিয়ে নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যায় মিনু। সামনে ধূ ধূ করছে ফাঁকা এরোড্রাম। বড় বড় গোল ফাঁকওয়ালা লোহার শিট পাতা। ফাঁকগুলো ভরাট করে চোরকাঁটা গজিয়েছে। এরোড্রামের তিনদিক আমগাছে ঘেরা, সবুজ। একদিকে রেল-লাইন। মালগাড়ির সান্টিংইয়ার্ড এরোড্রামের গা ঘেঁষে। অশোকের হাতের মধ্যে মিনুর হাতটা ধরাই আছে। আবেগে দোলায়িত হচ্ছে না, স্বাভাবিক ব্যাপার বাধা পার হতে যে হাতের ওপর নির্ভর করতে হয়, সে হাত শক্তি জোগায় বেহিসেবী হয় না।

—এখানে প্লেন নামে?

—নামতো আগে। বন্ধ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম কত লোকে প্লেন

দেখতে আসতো। অনেক দূর-দূর গ্রাম থেকেও। জানো, আমি তখন অনেক ছোট। বাবার সঙ্গে এসেছিলাম। নামতে দেখি নি, ওড়াটা দেখে-ছিলাম। প্রথমে তো প্লেনটা বেশ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। তারপর সবাইকে সরে যেতে বলল। এমন ছেলেমানুষ ছিলাম, প্লেনটার কাছ থেকে সরে যাবার আগে একটু ছুঁয়ে নিয়েছিলাম। তারপর যেই না ইঞ্জিন চালু করল, ভয়ে তো আমি আর পরেশ বাবাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ঝড়ের মত হাওয়া দিয়ে কখন যে উড়ে গেল বুঝতেই পারি নি।

অশোকের ভারি ভাল লাগে মিনুর এই সহজ অভিব্যক্তিটুকু।

—তো বন্ধ হয়ে গেল কেন ?

—কি জানি ? ওই বছর দুয়েক শুধু আমের সময় চালু ছিল। তারপর কোন একবার ভোটের আগে জানি হিন্দু-মুসলমান মারামারি বাধল। কয়েক-দিন থমথমে অবস্থা। তখন অনেকগুলো মিলিটারি প্লেন এসেছিল। মা তো সে সময় এক পা বাড়ির বাইরে যেতে দিত না।

শীতের দুপুরের রোদটা উপভোগ করতে বেশ লাগে। ওরা দু'জনে রানওয়ে ছেড়ে বাঁদিকে এগোয়। সামনের একটা আমগাছের ছায়ার ঠিক বাইরেটায় বসে পড়ে। অশোক রোদের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে। মিনুর চোখে রোদ পড়েছে। চোখের ওপর হাত তুলে আড়াল দেয়। অশোক মিনুর আঁচল টেনে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে বলে—রোদ লাগবে না। মিনুর সারা মুখে এক তৃপ্তির লজ্জা। হলদে শাড়ির ঘোমটার ভেতর দিয়ে রোদটা মিনুর সারা মুখে-হাতে হলুদ রং-এর প্রলেপ দিয়েছে। অশোক সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

—মিনু, গায়ে-হলুদ গায়ে-হলুদ লাগছে।

স্বপ্নের হাউইতে কে যেন আগুন দিয়েছে, বোঁ বোঁ করে উড়ে চলেছে। নরেশদা বেলে ছাড়া পেয়েছে। কেয়ার কথা ভেবে খুশী লাগে মিনুর। আজ এই মিষ্টি দুপুরটা তা না হলে এত ভাল লাগত না। এত আনন্দ ও একাই পাবে, না তা চায় না মিনু।

অশোকের মিনুর সঙ্গে ক'টা দিন থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অনেক কাজ, ওর এলাকায় এদ্দিনে একটা স্কোয়াড হয়েছে। শেল্টারও তৈরি। গতকাল রাতে জহরের সঙ্গে মিটিং ছিল। ভাবতেও ভাল লাগছে ওদের, এখানেও একটা অ্যাকশন হয়ে গেছে। দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই পার্টি-পত্রিকাতে বেরিয়ে যাবে রিপোর্ট।

মিহু আগে কোনদিন দেখে নি, একটা দাঁড়িয়ে থাকা বগিকে ইঞ্জিন আস্তে ধাক্কা দিল, বগিটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে আরেকটা বগির গায়ে ধাক্কা খেল।

—মিহু।

—কী। মুখ না ঘুরিয়েই উত্তর দেয়।

অশোক মিহুর চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। মিহু একটু হাসে।

—জেলাতে সত্যিকারের লড়াই শুরু হয়েছে। আমার এলাকাতেও এবার হবে। তোমার কাছে ক'দিন খুব থাকতে ইচ্ছে করছে।

মিহুরও তো তাই ইচ্ছে। কিন্তু ও বোঝে, এ কথা বলা উচিত না। অশোকের মনে হয়, জহর রবীন কেউই জীবনসঙ্গিনীর চিন্তায় সময় দিচ্ছে না। এই যে লড়াইয়ের আগে প্রেমিকার সঙ্গে থাকার ইচ্ছে, প্রেমটা কি পেছুটান ? নিজের মনের মধ্যেই দ্বিধা। একটু গম্ভীর হয়ে যায় অশোক।

মিহু বোঝে, কিছু একটা ভাবছে অশোক। সব ভাবনা তো আছেই। একটা দিন একটু সময়ও কী শুধু আমার কথা ভাবা যায় না। বেশ, আমিও অন্য কথা ভাববো। কিন্তু কী ভাববে, খুঁজে পাচ্ছে না। স্টেশনের দিককার আমগাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে একরাশ কালো ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অশোকের 'জাফর'-এর একটা 'শের' ভাসাভাসা মনে পড়ে—বড়ি দেরসে মিলে হ্যায় চারদিন / দো দিন বীত গয়া আরজু মেঁ / দো দিন ইন্তজার মেঁ। বাংলা করলে কী দাঁড়াবে, মনে মনেই ভাঁজতে থাকে অশোক—বহু প্রতীক্ষায় পেয়েছি চারটি দিন। দুটো দিন ; গেল পথ চেয়ে, আর দুটো মানভঞ্জনে।

—মিহু। হাত ধরে ওকে কাছে টানে অশোক। অশোকের বুকের ওপর মাথা রাখে মিহু। সারা শরীরের প্রতিটি শিরায় রক্তকণিকাগুলো যেন বেরোবার পথ খুঁজছে। অশোক মিহুর চোখের দিকে চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে চোখ বুজে আসছে।

কালীপুজোর রাতে সাঁওতালদের গান-নাচের দোলা যেন ওর বুকে। সেদিন ওদেরও পরবের দিন। সকালে উঠে বাড়ির সব পশুকে স্নান করাবে, শিং-এ কপালে তেল সিঁদুর দেবে, খুরে দেবে তেল। নতুন রঙীন দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের খেতে দেবে। তারপর নিজেরা মাতবে। তিন দিন তিন রাত মরদদের আর হুঁশ থাকবে না। দারু পিয়ে চলবে নাচ আর গান। মেয়েরা

মরদদের সামলাবে আর কোমর ধরে নাচবে। ঢোল বাজবে ড্রিম ড্রিম ধিংতা ধিং, একটানা গানের সুরে হো হো হো টান। অশোক শুনতে পাচ্ছে বহুদূর থেকে, মিনুর শরীরের প্রতিটি নিঃশ্বাসে যেন সেই দোলা।

—অশোক, তোমার ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করে না? একটা ছোট্ট ঘর তোমার আর আমার।

সুরের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে গেছে। অশোক হেসে বলে—ছোটসি ঝোপড়ি হমার? আমাদের এই ছোট সুখী সংসারটা কীরকম জান? কল্পন করো, একটা মশারির নীচে ছোট্ট বিছানা।

—অসভ্য। বিছানা ছাড়া বুঝি কিছু নেই।

—সে বিছানা নয় গো। ভাবো না খোলা আকাশের নীচে একটা ছোট্ট বিছানা। মশারির আবরণ দিয়ে সারা দুনিয়া থেকে আমরা আমাদেরটুকু বাঁচাতে চাইছি। এদিকে ঝড় উঠেছে, প্রবল ঝড়। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক, কালোমেঘের চাপা অন্ধকার নীচে নেমে এসেছে। এক্ষুণি হয়ত বৃষ্টি শুরু হবে—রক্ত বৃষ্টি। হয়ত বা মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। ছোট্ট ঘরটুকু আর তোমার আমার কী হবে?

কোন প্রলয়ের কথা বলছে অশোক?—তারপর?

—তারপর সূর্য উঠবে। রক্তে ধোয়া লাল টকটকে নতুন সূর্য।

মিনু মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে অশোকের চোখে অজানা আগমনী সুর বাজছে।

নীল ছোট্ট একটা পাহাড়, ছোট্ট একটা নদী— তাতে নীল আকাশের ছায়া আর সাদা মেঘের লুকোচুরি। তার কূলে নতুন চর। চরের বুকে সবুজ ফসল। প্রলয়ের ভয়ঙ্কর রাতগুলোতে অশোকের শক্ত হাত মিনুকে শক্তি জাগাচ্ছে তারপর—তারপর সবুজ চরটায় সবুজ ফসল পেকে সোনালী হচ্ছে।

মিনুকে আরও কাছে টেনে নেয় অশোক। আলতো করে ঠোঁটটা ছুঁয়ে দেয়। দু'জনেই চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

—উঠবে না?

—ইচ্ছে করছে না।

—তোমাকে কিন্তু ছাত্রী পড়াতে যেতে হবে।

ফাঁকা এরোড্রাম পেছনে ফেলে রাস্তার চড়াইটায় উঠতে থাকে দু'জনে।

২৪

—কী রে, সাতসকালে তুই ?

রাজু সাইকেলটা বেড়ায় ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে উত্তর দেয়—বেড়াতে আসি নি। কাজেই এসেছি, স্যার।

দু'জনে ঘরে বসে। রাজু হাতের কাগজ-মোড়া প্যাকেটটা টেবিলে রাখে।

—গ্রামে আরেকটা অ্যাকশন হয়েছে।

—কোথায় রে ?

—হরিশ্চন্দ্রপুরে।

মিনু ভাবে, কে জানে হয়ত অশোকের এলাকা। ও ঠিক জানে না, অশোক কোন্ দিকে কাজ করে। উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে—কেউ ধরা পড়ে নি তো ?

—না না। কোথায় কার পাত্তা পাবে।

রাজু ছেলেটাকে ভারি ভাল লাগে মিনুর। প্রায় সমবয়েসী। সবসময় ব্যস্ত ব্যস্ত ভাব। শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা সাইকেল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। মিনুর মনে পড়ে না সাইকেল ছাড়া রাজুকে কোনদিন দেখেছে কিনা।

—শহরের অবস্থা ভাল ঠেকছে না। গ্রামে অ্যাকশনের পর থেকেই সাদা পোষাকে মামার সংখ্যা বেড়ে গেছে। স্টেশনে বাস স্ট্যাণ্ডের ওপর দারুণ নজর রাখছে। গাজোলে শুনলাম ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর অনেকগুলো ক্যাম্প বসিয়েছে।

মিনুর ভয় হয়, বাসে-টাসে এসে ধরা না পড়ে অশোক। ও অবশ্য বলেই গেছে এরপর থেকে শহরে আসা সম্ভব হবে না।

—প্যাকেটে কিরে ?

—লিফলেট। মোড়কটা খুলে একটা মিনুকে দেয় রাজু। মিনু হাতে পেয়েই পড়তে শুরু করে। 'শ্রেণীশত্রুদের চিতা নিভতে দিও না।'

—এই, পরে পড়িস। কাজের কথা শোন।

মিনু লিফলেটটা ভাঁজ করে হাতে রাখে। রাজু মোট লিফলেটের অর্দ্ধেকটা মিনুকে দেয়।

—যেখানে পারিস, বিলি করিস। তবে বুঝে, পুলিশের লোকের হাতেই দিয়ে বসিস না। দিলি আর তুলে নিয়ে গেল।

—হ্যাঁ, তোর মত বোকা কিনা।

—বকিস না। সেদিন যা হয়েছে না। তোরা তো সাহসই করতিস না। পরশু মার্কসবাদীদের মিটিং ছিল। ঐ সেই অজয় মুখার্জী অনশন করছে না, সেই ব্যাপারে। ওদের কোন এক নেতা বক্তৃতা দিচ্ছে—'পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য, মন্ত্রিসভা থেকে আমাদেব বিতাড়িত করার জন্য এ হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত।' এদিকে আমরা সাতটা ছেলে মিটিং-এর ভীড়ের মধ্যে আমাদের লিফলেট বিলি কবছি। প্রচুর গ্রাম থেকে কৃষক এনেছিল। একটু বাদেই আমাদের লিফলেট নেবার জন্য প্রায় কাড়াকাডি পবে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে আমবাও লিফলেটগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ধরলে শালাবা পিটিয়ে শেষ করে দিত। বাইবে অবশ্য মালপত্র নিয়ে রেডি ছিল।

—তারপর ?

—ইদ্রিস ভিড়ের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। তখন মাননীয় এম. পি. চিত্রাব মালিক রে, শালা চীনবিরোধী ছবি এনে লোককে দেখায় আর ওখানে মাইক টেনে নিয়ে ঘোষণা করল—কমরেডস হঠকারি, কংগ্রেস সি. আই-এব দালাল নকশালদের প্রচারপত্রগুলো ছিঁডে ফেলুন। পরে ইদ্রিস বলল, অনেক কৃষকই নাকি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল।

—আচ্ছা কি হবে রে ? যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে যাবে ?

—দেখব ভাঙলেও যা থাকলেও তাই। পুলিশ মন্ত্রী যেই হোক, জোতদারদের বাঁচাতে অর্থাৎ শান্তিশৃঙ্খলা-রক্ষার্থে পুলিশ আসবে। আমাদের কিছু যায় আসে ? এই, আমি যাবো। গল্পে গল্পে দেরী হয়ে যাবে।

—বোস না।

—না রে, এগুলো আরেক জায়গায় দিতে যেতে হবে।

—গ্রামের কমরেডরা কবে আসবে, কিছু জানিস ?

—জহরদা, রবীনদা মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। অন্যরা বোধ হয় আসবে না চট করে।

—না আসাই ভাল, বল ? যেরকম নজর রাখছে, বলছিস।

—শোন একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে মনে হচ্ছে। জহরদা, রবীনদা এদের

বোধ হয় মতের মিল হচ্ছে না। রবীনদা তো দেখছি মাঝে মাঝেই টাউন-সংগঠনের সঙ্গে মিটিং করছে। কলকাতাও গিয়েছিল। নাঃ, কথা বাড়ালেই বাড়বে। আসি রে।

আবার নিজেদের মধ্যে মতের অমিল কেন? মিনু বাইরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। বাবা এখনও বাজার থেকে ফেরে নি। সজনে গাছটায় ফুল হয়েছে। ঘিয়ে ঘিয়ে সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। অল্প অল্প হাওয়ায় দোল খাচ্ছে ডালগুলো। সজনে ফুলের চচ্চড়ি বেশ লাগে। নাড়ুকে পাড়তে বলতে হবে।

ঘরে গিয়ে লিফলেটটা পড়ে ফেলে। তাহলে তিনটে হল, গাজোলে, বামনগোলায় আর হরিশ্চন্দ্রপুরে। লিফলেটটা বেশ লিখেছে। কার লেখা—জহরদার, অশোকেরও হতে পারে। ও তো ভাল লেখে। অন্য কারুরও হতে পারে। সবাইকে মিনু চেনেও না। একটা অংশ আবার পড়ে—এক থালা ভাত যেমন একবারে খাওয়া যায় না, এক মুঠ করে খেতে হয়, তেমনি গোটা দেশটা একদিনে মুক্ত হবে না। ছোট ছোট এলাকা শ্রেণীশত্রু-মুক্ত করে, মুক্ত গ্রামাঞ্চল দিয়ে শহরগুলোকে ঘিরে ধরতে হবে।

বাড়িটা ঝাঁট দেওয়া হয় নি এখনও। লিফলেটগুলো তোষকের নীচে চালান করে ঝাঁটা ধরে মিনু। শুধু ইট বিছানো মেঝেতো এত ধুলো জমে। দরজার কাছটায় ধুলো জড়ো করছে, বাইরে থেকে ভেতরটা ধুলোয় অন্ধকার দেখাচ্ছে।

—আরে, সুজিতদা। আসুন, অনেকদিন পরে।

—মেসোমশাই কোথায়?

—বাজারে। ছুটির দিন তো, বাজারে আড্ডা সেরে ফিরবে। ঝাঁটাটা দরজার কোণে রেখে কোমরে গোঁজা আঁচলটা খুলে দেয়।

—নরেশ বা জহরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা যাবে?

—জহরদার কথা বলতে পারবো না, নরেশদাকে করা যেতে পারে।

—একটা কাজ করবে?

—কী, বলুন।

—আমাদের মেসে দেবেন নামে একজন গ্রামের কমরেড কাল এসেছে। নরেশই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। বেচারার খুব ডিসেণ্ট্রি হয়েছে।

—এখন কেমন আছেন?

—ওষুধ দিয়েছি। তবে মুশকিল হচ্ছে আমাদের মেসটাতো জানই। এক

রবিই আমাদের লাইনের। বাকিগুলি তো এক একটি মূর্তিমান। রবির আত্মীয় বলে চালিয়েছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, বাজে মাল দুটো বুঝতে পেরেছে। রবি যদিও স্থস্থ না করে ছাড়তে চাইছে না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সরিয়ে অন্য কোথাও রাখা উচিত।

—নরেশদাকে কী বলবো, বলুন ?

—মানে, একজন গ্রামের কমরেডের সেফটির প্রশ্ন তো। কাল সন্ধ্যেবেলা অচেনা দুটো লোক মেসের সামনে খুব ঘোরাঘুরি করছিল। নরেশকে বোলো অন্য কোন শেল্টারে নিয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হয়।

—আচ্ছা, আমি আজ দুপুরেই খবর দেবো।

মিন্নুর মনে হয়, স্থজিতদা যেন ভয় পাচ্ছে। কী হবে, গুলি করে মেরে ফেললে তো চুকেই গেল। জেল—বছরের পর বছর আটকে থাকা, সেটা সত্যিই বিরক্তিকর। যদি ধরে জেলে পুরেই দেয় তো কী করবে ? ভেতরের বন্দীদের রাজনীতি দেবে। আর ? আর বাইরের জীবনের কথা ভাববে।

—মিন্নু, একটা কথা বলবো ? যদিও অনধিকার চর্চা।

—বলুন না।

—তুমি সত্যি সত্যি রাজনীতি করার কথা ভাবছো ?

—হ্যাঁ, ভাবছি।

—ছেলেরা যে ইনসিকিউরিটির মধ্যে কাজ করার ঝুঁকি নিতে পারে মেয়েরা তা পারে না, মিন্নু। খাওয়া না জুটলে কুলিগিরি করতে পারে, শোবার জায়গা না থাকলে গাছতলায় শুতে পারে। একটা মেয়ে এ-সমাজে পারে না মিন্নু। রাতারাতি মুক্ত-অঞ্চল তৈরী হবে না।

—এতসব ভাবি নি।

—না ভাবলে চলবে কেন ? এমন কাউকে কি জীবনসঙ্গী করা যায় না যে তোমার কাজে বাধা দেবে না, অথচ সামাজিক নিরাপত্তাটুকু দিতে পারবে। তোমার কাজেও সে সাহায্য করবে।

মিন্নু ভাবছে বলবে কিনা, অশোকের হাত ধরে ও চোখ বুজে চলতেও রাজি। মেয়েদের এ-আবেগ তুমি বুঝবে না, স্থজিতদা। ভয়-লোভ কিছুতে টলানো যায় না। বিপ্লবকে ভালবাসি আর অশোক আমার কাছে বিপ্লবের মূর্তরূপ।

—মিন্নু, আজ বিপ্লবের পথে যাদের দেখে জোর পাচ্ছো, তারা অনেকেই

হয়ত ধরা পড়বে। রাজনীতি থেকে ধাক্কা খেয়ে দূরে সরেও যেতে পারে অনেকে।

হঠাৎ যেন পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। মহাশূন্যে ওকে নিয়ে কেউ যেন লোফালুফি খেলতে লাগলো। যদি কোনদিন এ-প্রশ্ন সামনে আসে বিপ্লব, না অশোক? জানি না, জানি না আমি কী করবো। সুজিতদা স্বার্থপর, সুজিতদা সব ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। অশোকদের শ্রদ্ধা করি। না না, এ হতে পারে না। অশোক পেছুবে না কোনদিন।

—মানুষের ওপর এটুকু বিশ্বাস জন্মেছে, সুজিতদা। ধরা পড়ে বা বসে পড়ে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তা কি আর ভরাট হবে না?

সুজিত শুকনো মুখে তাকায়।

—আজ উঠি, মিনু। একটু থামে সুজিত, উঠে দাঁড়ায়।—ভাবছি অন্য কোথাও বদলি নেবো।

—কেন?

—না, এমনি। বছর চারেক তো হল এখানে। আমাদের তো বদলিরই চাকরি। দেখি চেষ্টা করে বাড়ির কাছাকাছি কলকাতার দিকে কোথাও হয় কিনা।

সুজিতদা পালাতে চাইছে। কিন্তু কোথায় পালাবে? সুজিতদা তোমাকে দেখে আমার করুণা হচ্ছে।

—আসবেন আবার সময় পেলে।

—হুঁ। পেছন ফিরে একবার তাকায় সুজিত।

মিনুর সহজ অভিব্যক্তি, কোথাও কোন ভাবান্তর নেই।

—আচ্ছা, চলি।

সুজিতদা কি সত্যি সত্যিই বদলি নেবে! এত ভয় পাচ্ছে কেন? সবাইকে এগোতে চেষ্টা করতে হবে, কেউ যদি পিছিয়ে পড়ে, বসে হা-হুতাশ করলে তো চলবে না। পথ-চলার নতুন সঙ্গী খুঁজে নিতে হবে। কত সহজে কথাগুলো বলে অশোক। অশোক পিছিয়ে পড়লে আমি কি ওকে ফেলে এগুতে পারবো? যত বাজে চিন্তা। অশোক পেছুতে পারে না। ওর চোখ ভরে স্বপ্ন। সেগুলো তাড়াবে কী করে?

অনেক বেলা হয়ে গেল, বাবা যে কোথায় গল্প জুড়েছেন। আগে রবিবারের সকালগুলো বেশ কাটত। কী যে হোল হঠাৎ, বলল স্টাডি ক্লাসের দরকার

নেই। কত কিছু জানা যেত, চিন্তা-ভাবনাগুলো আলোচনার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হত। নির্দেশ এল বেশী পড়ে কিছু হবে না, কাজ কর। এত দেরী করছে বাবা, ক'টায় যে রান্না শেষ হবে। সুজিতদা এসেছিল শুনে বাবা খুশী হবেন। বাবা আজকাল বোঝেন যে কিছু কিছু রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে আমি জড়িত। তাই মাঝে মাঝেই বলে—মেয়েদের শ্বশুরের ঘর করতে হয়। বেশী ঝামেলায় জড়াস না। আর ঝামেলা, সব ঝামেলা চুকে-বুকে গেছে। কেউ জানে না। অশোক শুধু জহরদাকে বলবে, বলেছিল। এরপর জহরদার সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করবে।

অশোককে আমি ভালবাসি—কেউ জানে না। পাঁচকানে গেলেই পাঁচ কথা। শুধু আমি আর অশোক।

২৫

চোখ না তুলেই বলেছিলে—ভালো
মন বাড়িয়ে কনে দেখা আলো।

যত ন্যাকামি। এ-লেখায় আবার কবিমানসের বিশ্লেষণ। বাংলায় অনার্স পড়তে গিয়ে যে কত হাবিজাবিই পড়তে হয়েছিল। অশোককে রাত বেশী হওয়ার আগেই কালাদের গ্রামে পৌঁছোতে হবে। ধুতিটা হাঁটুর ওপর ওঠানো, সাদা শার্ট, পায়ের হাওয়াই চপ্পলটা একটানা ফ্যাট-ফ্যাট শব্দ করছে। চৈত্রের শুকনো পথের রাঙাধুলো চুলগুলোকেও বাদ দেয় নি। অশোকের মনে হয়, কলকাতায় যে স্কুল-কলেজে অ্যাকশন শুরু করেছে, তার অনেকগুলো পজিটিভ দিক আছে। মধ্যবিত্তের কেরিয়ারিজমের বারোটা বাজানো দরকার। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে যত বেশী পড়ে সে তত মূর্খ হয়—কথাটার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি থাকলেও জীবনে বিপ্লবের প্রয়োজনে ইংরেজী বাংলা বর্ণপরিচয়ই যথেষ্ট।

বিকেল থেকে মেঘ করেছে। একটু আগেও হাওয়া দিচ্ছিল। ছোট ছোট ধুলোর ঘূর্ণিগুলো আলের বাধা ভেঙে এমাঠ ওমাঠ ছুটোছুটি করছিল। হাওয়াটা থেমে গেছে। চারদিক থমথম করছে। আজও বৃষ্টি হবে। তাহলে তো মনিরাম বেটা নাও যেতে পারে। মনিরাম ভকত, দেড় হাজার বিঘের ভূস্বামী।

মহাজনী কারবারে যে কত খাটছে, তা ভগবানের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টও জানে কিনা সন্দেহ। গাঁয়ের শেষ মাথায় রক্ষিতাকে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে। দু'দিন ওৎ পেতেছিল—সে দু'দিনই যায় নি। জায়গাটা ভাল, ভকতের বাড়ি থেকে রক্ষিতার পথের আশে পাশে একটাও ঘরদোর নেই। নিশ্চিন্তে কাজ সেরে ফিরে আসা যায়। গেলে নটার মধ্যেই যায় বেটা। কালারা জানি বেশ্যাকে কি বলে?—ঢেমনি। গিয়ে দেখতে হবে, কালা মাঙ্গন এরা কি খবর নিয়ে রেখেছে? আজ হলে হয়।

আগের দিন কি ঝামেলাতেই না পড়েছিল অশোকরা। চারজনে খাপুরিয়া গ্রামটাকে এড়িয়ে আলপথেই ফিরছিল। হঠাৎ ছ'ব্যাটারীর টর্চের আলো এসে পড়ল—দাঁড়াও। আলোর পেছনে বেশ বড় একটা দল এগিয়ে আসে। খাপুরিয়ারই হবে। ভকতের অ্যাকশনও হল না, অহেতুক রাত অব্দি বসে থেকে এখন এই বিপদে পড়তে হল। মাঝরাতে হাঁসুয়া হাতে ধরতে পারলেই হয়েছে। কাল সকালে থানা-পুলিশ, জেল। কালা আর মাঙ্গন চট করে অশোক আর বসনার আড়ালে চলে যায়। হাতের হাঁসুয়া দুটো ছুঁড়ে দেয়। অশোকের হাতে একটা বাঁশের লাঠি, চাকুটা বোধ হয় বসনার কোমরে ধুতির মধ্যে লুকিয়েছে। যদি তল্লাসী নেয়?

রাত-পাহারার দলটা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেরা চালায়। কোন্ গাঁয়ের, কোথাও গিয়েছিলে, অমুক গাঁয়ের তো তমুককে চেনো কিনা? স্থানীয় লোক, তাই রক্ষে। রাত-পাহারার দলের মধ্যে মাঙ্গনের কুটুম বেরিয়ে গেল। মাইল দশেক উত্তরে বামনগোলায় রবীনের স্কোয়াডের অ্যাকশনের পর থেকেই এ-ঝামেলা শুরু হয়েছে। তার ওপর অশোকেরই এলাকায় গুজর নামে এক গেরিলার বাড়িতে গোটা কয়েক বোমের স্টক রাখা ছিল। সে বেটা দিন পনেরো আগে এক কেলেঙ্কারি করেছে। মাল খেয়ে জোসের মাথায় দু'হাতে দুই বোমা নিয়ে দুর্গামণ্ডপের চাতালে তড়পাতে শুরু করে—এই শালা হপনা তোর মহাজনী ছুটবে রে, খান্‌কির ছেলে। প্রথমে একপাল বাচ্চা ভীড করে মজা দেখতে থাকে। লাল পার্টি এসে গেছে রে শালা, মার শালা বোম ভদাম্। আস্তে আস্তে বড়রা জোটে। গুজরের নাচ শুরু হয় হাতে বোমা ঝুলিয়ে।

—হপানের কাটা মুণ্ড দেখ মা-কালী। কাছে কেউ ঘেঁষতে চাইলেই ভয় দেখায়, মারবো শালা একটা বোমা।

জড়ো হওয়া গাঁয়ের লোকেরা বুঝতে পারছিল না, ওর হাতে ও দুটো সত্যি

বোমা কিনা। তারপর অশোকদেরই দু'চারজন সমর্থক ওকে নিরস্ত্র করে। কিন্তু ভোর হতে না হতেই পুলিশ আসে। হয়ত হপন মহাজনই খবর পাঠিয়েছিল। বোমা দুটো অন্য সমর্থকেরাই সরিয়ে দিয়েছিল। তাতে পুলিশের আরও সন্দেহ বাড়ে। গুঞ্জরকে তুলে নিয়ে যায়। এখনো ছাড়ে নি। গত দু'একদিনের খবর জানে না, হয়ত শহরে চালান করবে। অশোকেরই দোষ, গুঞ্জরের ক্ষেতমজুর শ্রেণী-চরিত্র ও জঙ্গী মনোভাব দেখে স্কোয়াডে নিয়েছিল। মদ মাঝে মাঝে সব সাঁওতালেরাই খায়। কে জানতো, এমন কাণ্ড বাধাবে!

প্রতি গাঁয়েই এতসব ঘটনার পর জোতদারেরা সাবধান হয়েছে। কংগ্রেসী থেকে মার্কসবাদী সব পার্টির লোকেরাও একজোট হয়েছে শান্তি রক্ষায়। কার ঘরে ধন সম্পদ, আর কে দেয় পাহারা। রাতে চলাফেরাতেও বেশ মুশকিল হচ্ছে।

রবীনের সঙ্গে দেখা করে ফিরছে অশোক। আজকাল এলাকাগতভাবে গ্রামেই দেখা করে ওরা। জহরটার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। রবীন বলছিল, জহর নাকি পার্টি-লাইনের সঙ্গে একমত নয়। জহর নাকি গণ-সংগ্রাম, গণ-আন্দোলন করার কথাও বলছে। অশোক ভেবে পায় না, কী করে এ-কথা বলছে জহর। যেখানে গোপন সংগঠনই শত্রুর আক্রমণের মুখে টিঁকিয়ে রাখা যাচ্ছে না সেখানে খোলা সংগঠন তো এক নিমেষে পিষে দেবে। কোথাও একটা গড়বড় হচ্ছে। রবীনের এলাকাতে অ্যাকশন হয়েছে প্রায় দু'মাস হল। স্কোয়াডকে দ্বিতীয় অ্যাকশনে নিয়ে যেতে পারছে না। রবীন তো বলল, পুরোনো স্কোয়াডের ছ'জনের ভেতর মাত্র দু'জন টিঁকে আছে। পুরোনো এলাকাতে থাকতেও পারছে না রবীন। আবার নতুন করে স্কোয়াড করেছে বলল। আশা করছে কয়েক দিনের মধ্যেই অ্যাকশন হবে।

অশোকের তো মনে হচ্ছে, ওর স্কোয়াডের মরাল হাই। দু'দিন ওৎ পেতে তো দেখলো, তেমন ভয় পায় নি কেউ। একটা অ্যাকশন হবার পরে অবশ্য কী হবে জানে না। রজতের ওখানেও একটা হয়ে আর হয় নি। অথচ মেদিনীপুর শ্রীকাকুলাম নকশালবাড়িতে তো বটেই পাঞ্জাব-কেরালা-আসাম সর্বত্র অ্যাকশন হচ্ছে। পার্টির কাগজে তো সর্বত্রই অ্যাকশনের সাকসেস ঘোষণা করছে। কেন্দ্রীয়-নেতৃত্বের কারুর এসে দেখা উচিত। অশোক আসার আগে নাকি জেলা সংগঠনী কমিটি তৈরি করার সময় কেন্দ্রীয় কমিটির একজন

কমরেড এখানে এসেছিলেন, শুনেছে অশোক। ওর আসাও তো প্রায় এক বছর হতে চলল। জহর তো রিসেণ্টলি কাউকে পাঠানোর জন্য বেশ কয়েকবার লিখেছে। কি যে করেন নেতারা, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না অশোক। সবাই কি মেদিনীপুর শ্রীকাকুলাম নিয়ে ব্যস্ত? শুধু এখানে নয়, আশপাশের জেলাগুলোতেও কারুর পাত্তা নেই।

একটু তাড়াতাড়িই পা চালায় অশোক। আকাশে মেঘ করে আছে। রাত থাকতে চারকোশ হেঁটে রবীনের ওখানে গিয়েছিল। এখন আবার ফিরছে। দিনের আলোয় আর আজকাল চলাফেরা করে না। পরশু দুপুরে কালার বাড়ি থেকে মাঙ্গনের বাড়ি যাচ্ছিল, পথে একটা লোককে অশোকের সন্দেহ হয়েছিল। ধুতি-শাড়ি-ছিট কাপড় ফেরি করতে এসেছিল। এ-সময়ে ঠিক এরা আসে না। অগ্রহায়ণে নতুন ফসল ওঠার পরেই আসে। তাতেই আরও সন্দেহ হয়েছিল। ফিরে গিয়ে কালাকে বলেছিল অশোক। কালা লক্ষ্য রেখেছিল। লোকটা নাকি হপন মহাজনের বাড়িতে মাল বেচার ভাণ করে মহাজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিল। হপন মহাজন আজকাল দারুণ সাবধান হয়ে গেছে। তাই অশোকরা ভকতকেই আগে নিকেশ করবে ঠিক করেছে। নজর পড়েছে এ-অঞ্চলটার ওপর। সত্যিই একটু সাবধান হওয়া দরকার। অশোক সামনে পেছনে একবার দেখে নেয়। যতদূর চোখ যায় ধূ-ধূ করছে ফাঁকা মাঠ আর আলপথ।

যদি কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যেত তাহলে অশোক অনেকগুলো স্কোয়াড করতে পারতো। বন্দুক পিস্তল থাকবে না শুনে আরো অনেকে পিছিয়ে গেছে। সামনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা পার হয়ে আবার ওপাশে আলপথ ধরবে। আল ছেড়ে বোর্ডের রাস্তায় ওঠার মুখে শুকনো নালা। পাড়েই একটা বড় পাকুড় গাছ। এখনো অনেকটা। পাকুড়ের গা ঘেঁষে বাবলা, কুল আর ছোট খেজুরগাছের ঝোপ আছে একটা, বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে। এখান থেকে ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না।

কলকাতার বস্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে নাকি ভাল কাজ হচ্ছিল। কিন্তু শ্রমিক কমরেডরা গ্রামে আসছেন না কেন? কাকুলামে অনেক ক্ষতি হয়ে গেল, তবুও লড়াই এগোচ্ছে। খুশী লাগে অশোকের। গুণগুণ করে গাইতে থাকে—

মোদের পতাকা লালে লাল খুনে
মেহনীত জনতার
দু'চোখে স্বপ্ন শত শহীদের চলেছি দুর্নিবার।

হঠাৎ কনে-দেখা আলো, কথাটা মনে পড়ে। মিনুর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি। আগামী মাসের মাঝামাঝি দেখা হবে। জেলা-কমিটির রিভিউ মিটিং আছে। আর এখানে এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ যে, এতবার ভাবা সত্ত্বেও মিটিং শহরেই করতে হচ্ছে। মিনু এখন কী করছে? ছাত্রী পড়াতে গিয়েছে বোধ হয়। একটা ঘাঁটি-এলাকা তৈরি হলে মিনুদের আর শহরে পড়ে থাকতে হবে না। সেদিন আর দূরে নয়। মুক্ত এলাকা আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে। অশোকদের এখানে না হোক, হয়ত মেদিনীপুরে হবে। হয়ত মেদিনীপুর থেকে শ্রীকাকুলামে ফৌজ মার্চ করবে। তখন তো পার্টি আমাদেরকে ওখানে যাবার ডাক দেবে।

ন্যায়ের পতাকা তুলেছি আমরা
অন্যায়েরই যম
বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে লক্ষ্যে চলেছি
জোর কদম।

বাঁ পাশের ঝোপটায় কী যেন নড়ে উঠল। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। শেয়াল? ভর সন্ধ্যে-বেলা গাঁয়ের এত কাছে? তবে কি সাপটাপ? হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চ জ্বলে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে যায় অশোকের। বসে পড়েই পেছন দিকে ছুটতে চেষ্টা করে। শক্ত হাতে কে যেন কব্জি চেপে ধরে। পিঠে একটা নলের স্পর্শ। সামনে পেছনে অনেক পুলিশ। দারোগার নির্দেশে হাতকড়া পরায়।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার বাঁকে জীপ দাঁড়িয়ে। অশোককে ঠেলে দেয় জীপের গহ্বরে।

রাস্তার ওপারেই কালাদের গ্রামে মাজন, কালা আর বসনা অপেক্ষা করে আছে।

জৈষ্ঠের প্রচণ্ড রোদে সারা অঞ্চল জলে যাচ্ছে। ধুলোর ঝড়ের দাপট রুখতে সব ঘরদোরের জানলা-দরজা বন্ধ। সরকারী বড় কর্তা আর পয়সাওয়ালা বাবুদের খসখসে মাইনেকরা লোকেরা জল দিচ্ছে। গায়েসপুরের দিকে পরশু সন্ধ্যাবেলা আগুন লেগেছিল। পুরো গ্রামটাই প্রায় পুড়ে গেছে।

সারা শহর জুড়ে শুধু উত্তাপ, কখন কোথায় কি জ্বলে উঠবে কেউ জানে না। গত দু'এক মাসে অনেক কিছুই জ্বলেছে। জ্বলেছে অনেক স্কুলেরই চেয়ার, টেবিল, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। কলেজে লাল পতাকা উড়েছিল টানা তিন দিন। ভয়ে পুলিশ নামতে পারছিল না, পতাকার সঙ্গে নাকি বোমা বাঁধা ছিল। সি. আর. পি., ই. এফ. আর. আর সাদা পোষাকে শহর ছেয়ে গেছে। আগুন তাতে কি আর নেভে। বেসামাল পুলিশবাহিনী এক একদিন এক একটা এলাকা রাতের অন্ধকারে ঘিরে ধরে তল্লাসি চালিয়েছে। পনেরো থেকে পঁচিশের যুবকদের সন্দেহের বশে ধরে নিয়ে গেছে। ধরা পড়েছে অনেকেই। আবার পুলিশের আকাঙ্ক্ষিত অনেকেই দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে আছে। রমেন, সুবল, প্রশান্ত ধরা পড়েছে। সুবল নাকি মারের চোটে অনেক কিছুই বলে ফেলেছে। অবশ্য খুব বেশী খবর ও রাখে না। পার্টির ওপর ভারতজোড়া অত্যাচার নেমে এসেছে। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে গোপনে নাকি বেরোচ্ছে। উত্তরবঙ্গের কোথাও পৌছোচ্ছে না।

রবীন শহরের উল্টোপাড়ে মহানন্দা নদীর ধারে মাঝিদের একটা গ্রামে অপেক্ষা করছে। জেলা-কমিটির মিটিং। বাইরে গ্রামে ঢোকার মুখে এই গ্রামের দুটি ছেলে ও শহরের তিনটি ছেলেকে নিয়ে গোবিন্দর নেতৃত্বে একটা স্কোয়াড পাহারা দিচ্ছে। কলকাতা থেকে কিছু পিকরিকের বোম আর পাইপ-গান এনেছে রবীন। মাস-দুয়েক আগে জহর পদত্যাগ করলে রবীনই জেলা-কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। নৃপেন রবীনকে জিজ্ঞেস করে—পার্টি-কংগ্রেসের রিপোর্ট মিটিং-এ রাখছিস তো?

—উঁ, ভাবছি। ছোট করে বলে দেবো। তুই একবার বালুরঘাট ঘুরে

আয়, বুঝলি। আমি এদিকটা একটু না সামলে দিনাজপুরে বেশী সময় দিতে পারবো না।

পার্টি-কংগ্রেসের পর মনোজদা রবীনকে পশ্চিম দিনাজপুরেরও দায়িত্ব নিতে বলেছেন। মনোজদা রাজ্য-কমিটির সম্পাদক না হলেও পশ্চিমবঙ্গে উনিই এখন সব। আরেকজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৌমেনদা এখানে দু'দিন ঘুরে গেছেন। শহর-সংগঠনের সঙ্গে বসেছেন, গ্রামেও দু'তিনটে স্কোয়াডের সঙ্গে বসেছেন, সৌমেনদা তো মোটামুটি ইমপ্রেসড, ক্ষেত-মজুর, গরীব চাষীর ওপর জোর দিয়ে স্কোয়াড গড়তে বলেছেন। স্কোয়াডে মধ্য-কৃষক ঢুকেই এদ্দিন লড়াই আটকে গেছে। পশ্চিম দিনাজপুরের যোগাযোগগুলোও দিয়ে গেছেন। কখন যে কী করবে রবীন।

—নৃপেন, নরেশের সঙ্গে বাকি সকলের তো নদী পার হয়েই আসার কথা, না?

—ঐ তো আসছে।

রবীন দেখে, নরেশের পেছনে জহর, দেবেন, বিষ্ণু, রজত আসছে। রবীন সিগারেট ধরায়, পকেট থেকে ছোট একটা নোট লেখা কাগজ বার করে। সবাই এসে বসে। কে কেমন আছে ইত্যাদি খোঁজখবর নেয়। রবীন গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করে—কমরেডস, এতজন বেশীক্ষণ এক জায়গায় থাকাটা উচিত নয়, আমরা জানি। তাই মিটিং আমাদের যত সংক্ষেপে সম্ভব শেষ করতে হবে। প্রথমে কাজের রিপোর্টিং রাখছি। আমাদের এই জেলায় গত মিটিং-এর পর থেকে অর্থাৎ কমরেড জহর সম্পাদক হিসাবে পদত্যাগ করার পর থেকে আরও তিনটে খতম হয়েছে। দুটো গ্রামে, একটা শহরে।

—কমরেড, শহরে খতমের সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে? বিষ্ণু জিজ্ঞেস করে।

—কমরেড আমি রিপোর্টিং-টা শেষ করি, তারপর প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

জহর একধারে চুপ করে কাগজে নোট নিচ্ছে। বিষ্ণু ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠছে। অ্যাকশনের বিস্তৃত বিবরণ শুনতে শুনতে নৃপেন ও দেবেন উৎসাহিত হয়ে উঠছে। রজত একদৃষ্টে রবীনের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছে। সব কথার মাঝে নরেশের মাথায় আগামীকাল শহরে সি. আর পি অ্যাকশানের যে পরিকল্পনা হয়েছে তার খুঁটি-নাটি নিয়ে ভাবনা ঘুরছে।

—কমরেডস, এই তো গেল আমাদের এখানকার খবর। আমরা আশা

করছি অতীতের ভুলত্রুটি কাটিয়ে আমরা আগামী কিছুদিনের ভেতরেই আরও বড় লড়াই এ-জেলায় গড়ে তুলতে পারবো। আরও বহু নতুন কমরেড গ্রামে আসছেন। শহরে আমাদের অনেকগুলো স্কোয়াড তৈরী হয়েছে। আমরা শত্রুর চোখের ঘুম কেড়ে নেবো আর কয়েকদিনের মধ্যে।

বিষ্ণু বুঝে উঠতে পারছে না, যা হচ্ছে তার পরিণতি কী? কলকাতা থেকে মালদা, সব শহরে এই অ্যাকশনগুলোতে ফসল কী উঠবে? গ্রামের কাজে কিছুই এগোতে পারছে না। স্কোয়াডগুলো ধরে রাখা তো দূরের কথা, গ্রামে থাকাই মুশকিল হচ্ছে। ই এফ আর ক্যাম্প বসেছে, এলাকা ঘেরাও করে গ্রামকে গ্রাম তছনছ করছে। গ্রাম মুক্ত করে ছোট শহরকে ঘিরে ধরা, তারপর বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চল দিয়ে বড় শহরকে ঘিরে ধরা—এই তো চেয়ারম্যান-নির্দেশিত রণনীতি। যা হচ্ছে, তা কি গ্রাম-শহরে একই সঙ্গে অভ্যুত্থানের চেষ্টা নয়? গ্রামে আশানুরূপ সাফল্য আনতে পারছি না। কিন্তু কেন, তা না ভেবে শহরে শহীদদের হত্যার বদলা নিতে হবে, জহরের যুক্তিগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে বিষ্ণুর মাথায়। তেলেঙ্গানার লড়াইকেও শোধনবাদীরা তুলে এনেছিল কলকাতা শহরে।

রবীন বক্তব্য শেষ করে একটা সিগারেট ধরায়। রজত চুপচাপ, সিগারেটের খালি প্যাকেট কুচি কুচি করে ছিঁড়তে থাকে। জহর নোট করা শেষ করে বিড়ি ধরায়। এতগুলো লোক অথচ সবাই চুপচাপ, অস্বস্তিকর নীরবতা। নরেশ শুরু করে—কমরেডস, কমরেড সম্পাদক যা বললেন তার সঙ্গে আমি দু'একটা কথা যোগ করতে চাই। আমাদের অশোক ও বরুণ ছাড়াও আরও একজন নতুন কর্মী গ্রাম থেকে ধরা পড়েছেন। আর শহরের তো কথাই নেই। রোজ কিছু কিছু ছেলেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। রমেনদের ওপর থানাতে প্রচণ্ড অত্যাচার করছে। থানার আশপাশের বাড়ির লোকেরা আর্তচীৎকারে ঘুমোতে পারছে না। বোষ্টম দারোগা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ইদ্রিসের বাড়ি ভাঙিয়েছে। ওর বুড়ি মায়ের পিঠে বোষ্টম দারোগার বুটের লাথি পড়েছে। গ্রামের কৃষক কর্মীদের ওপরও যথেচ্ছ অত্যাচার চালাচ্ছে। এদের বেঁচে থাকতে দিলে চলবে না।

—কমরেড সম্পাদক, আমি একটু বলতে পারি? জহর জিজ্ঞেস করে।

—নিশ্চয়ই, বলুন।

—শহরে এই অ্যাকশনগুলোর সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে, জানতে পারি?

—কেন, টাউন-কমিটি!

—পার্টির প্রোগ্রামে কোথায় এ-ধরণের অ্যাকশনের নির্দেশ আছে?

—কমরেড জহর, প্রোগ্রামে, আপনি ভাল করেই জানেন সব, ডিটেল দেওয়া থাকে না।

—বেশ, কিন্তু কেন করা হচ্ছে?

—কমরেড, কেন করা হবে না? আজকে বিপ্লবী যুব-ছাত্ররা সংগ্রাম করতে এগিয়ে আসছেন, আপনি কী পেছন থেকে রাশ টেনে ধরবেন সংশোধনবাদীদের মত?

—কমরেড সম্পাদক, এতদিন কিন্তু আমরা বলেছি গ্রাম কেন্দ্র, বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

—কমরেড, শত্রুর শক্তির একটা বিরাট অংশকে আমরা এতে শহরে আটকে রাখতে পারছি। এতে কি গ্রামের লড়াই উপকৃত হচ্ছে না? পরি-পূরক কাজ বলতে কি শুধু পোস্টার মারা আর চাঁদা তোলা? তাছাড়া শ্রেণী-শত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়ে বিপ্লবী যুবছাত্ররা আজ অগ্রণী-বাহিনীতে পরিণত হচ্ছে।

—আপনি কি ভেবেছেন যে, এটা গ্রাম-শহরে একসঙ্গে অভ্যুত্থানের রাজ-নীতি।

—কমরেড ব্যাপারটা আপনি যান্ত্রিকভাবে দেখছেন। আপনি আজকের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবুন, সাম্রাজ্যবাদ আজকে পাতা নড়ার শব্দে কাঁপছে। কম্বোডিয়া আক্রমণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছে। আজ যে যেখানে যেভাবে পারবে, শত্রুকে আঘাত হানবে।

—রবীন, আমার প্রথম প্রশ্ন হল চেয়ারম্যান মাও এখনও বেঁচে আছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন তিনি বা চীনের কমিউনিস্ট পার্টিরই কী করা উচিত নয়? আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা আগ বাড়িয়ে এসব কথা বলতে যাচ্ছি কেন? আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভুল মূল্যায়ন থেকে কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে কাজকর্মের ধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের যুক্তফ্রন্টের ওপর জোর দেওয়া উচিত। সে কথা তো কোথাও বলা হচ্ছে না!

একসঙ্গে জহরের এতগুলো প্রশ্নে রবীনের মাথা গরম হয়ে ওঠে।

—কমরেড, জহর। নৃপেন মাঝখানে জহরকে থামাতে চেষ্টা করে।—কমরেড,

আপনি তো এতদিন এ-জেলার নেতৃত্বে ছিলেন, বিপ্লবের কাজ এগোয় নি কেন? আজ দেখুন, সামান্য দু'মাস সময়ের মধ্যে জেলার জনগণের বিপ্লবী শক্তির প্রকাশ। স্বলবেড়ি একটা সি. আর. পি মরেছে, দুটো রাইফেল জনগণের দখলে এসেছে। আপনি কি বলতে চান, জনগণ এগুলো করতে চাইলে আমরা বাধা দেবো? সংশোধনবাদীদের মত বলবো—না হে, শহরে এখনও বিপ্লব করার সময় আসে নি, শ্লেট পেন্সিল নিয়ে মার্কসবাদ পড়?

—কমরেড, প্রশ্নটা সেখানে নয়, আমরা কি স্বতঃস্ফূর্ততার লেজুড়বৃত্তি করবো, অসহিষ্ণু পাতি-বুর্জোয়া-শ্রেণীর নৈরাজ্যবাদী চিন্তার অসহায়তার দাসে পরিণত হব?

রবীন আলোচনার হাল ধরতে সচেষ্ট হয়।—কমরেড জহর, আমি একে একে আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি। প্রথমতঃ আমি আপনাকে পুরো ভারতবর্ষকে মাথায় রাখতে বলবো। শুধু পশ্চিমবাংলায় যেখানে সত্তরটি খতম হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের কাছে আছে মাত্র চারটি খতম ও একটি জখমের অভিজ্ঞতা। কমরেড, পার্টি-কংগ্রেসে সারা ভারতের সংগ্রামী কমরেডরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে একমত।

—কমরেড, কংগ্রেসের কথা জানি না, কিন্তু চেয়ারম্যানের ২০শে মে'র স্টেটমেণ্ট পরিষ্কার বলছে—'নতুন একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা এখনো বিরাজ করছে'। শুরু হয়ে গেছে, এ-কথার ইঙ্গিতও কোথাও নেই। যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে কী বক্তব্য?

—জহর, আপনি প্রথম থেকেই পার্টি-লাইনের বিরোধিতা করবেন স্থির করে রাখলে তো আলোচনা এগোন যায় না।

জহরের চেয়ারম্যানের 'অন প্র্যাকটিস'-এর একটা জায়গা মনে পড়ে—'বামপন্থীদের চিন্তা একটা বিশিষ্ট স্তরের বিকাশের বাস্তব প্রক্রিয়াকে ছাড়িয়ে চলে যায়। অনেকে তাঁদের কল্পনাগুলোকে সত্য বলে মনে করেন, আবার অনেকে যে আদর্শকে ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত করা যেতে পারে, তাকে জিদ করে এখনই সম্পন্ন করতে চান। তাঁরা বেশীর ভাগ জনগণের চলতি ক্রিয়াকলাপ থেকে ও বর্তমানের বাস্তব অবস্থাগুলো থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং তাঁদের কাজকর্মে তাঁরা হঠকারী হয়ে পড়েন।

রবীন তার বক্তব্য বলে চলেছে—যখন সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে দেশের

কিছু কিছু অংশে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হযেছে, কেবলমাত্র তখনই এই ফ্রণ্ট গডে তোলা যাবে।

জহবেব আব প্রতিবাদে সোচ্চাব হওযাব উৎসাহ নেই। তা না হলে তাবৎ মনীষীদেব উদ্ধৃতি দিযে বলতে পাবে—যুক্তফ্রণ্ট একটা প্রক্রিয়া, সংগ্রামেব সর্বস্তবে যুক্তফ্রণ্ট গডে ওঠে, আবাব ভেঙ্গে যায। কাকে বলবে? পার্টি নেতৃত্ব পডা শোনা বন্ধ কবেছিল, ক্যাডাবদেব নাকি তিনটি লেখা বেডবুক আব কে এম-এব বচনা পডলেই চলবে। সামনে যাবা বসে আছে তাদেব তাত্ত্বিক মান এত নীচু যে, বলাব নয। দেবেন—'ইশতেহাব অব্দি পডে নি, বজত সৎ পবিশ্রমী, কিন্তু 'কৃষকেবা যা ভীতু, শেষ পযন্ত খতমটা তো আমাকেই কবতে হল এ কথা বলতে বা কবতে ও কতটুকু চিন্তা ববে, জহব জানে না। কিন্তু জহবেব আশ্চয লাগে—ববীন নৃপেন এবা তো খানিকটা মার্কসবাদ পডেছে, এবা কি কবে মেনে নিচ্ছে?—কমবেডস্, আমবা সবাই তো সাংহাই আপসাজেব ইতিহাস পডেছি। গ্রামে সংগ্রাম ঝিমিযে পডেছিল, তাই ওখানে কমবেডবা শহবে চমকপ্রদ কিছু কবে পার্টিব মধ্যে উৎসাহকে বাঁচিযে বাখতে চেযেছিলেন। এই হঠকাবিতাব কী প্রচণ্ড মূল্য পার্টিকে দিতে হয়েছিল, তাও নিশ্চযই আমাদেব মনে আছে।

—জহব, তুই বেসিক একটা জিনিস বুঝতে পাবছিস না। আজকে এটা একটা নতুন যুগ, সাম্রাজ্যবাদেব সামগ্রিক ধ্বংসেব যুগ, আক্রমণেব যুগ।

—কিন্তু মাও সে তুং বলেছেন, যুদ্ধেব উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে বক্ষা ও শত্রুকে ধ্বংস কবা।

—তা নিশ্চযই, কিন্তু আজকে আত্মদানেব যুগ। কমবেড, শুধু কেতাবি বুলি দিযে বিপ্লব হয না। দেশেব এবং বিশ্বেব বাস্তব অবস্থাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি কবতে হয। আপনাকে আমি বাববাব বলছি, এই মূল সত্যটা উপলব্ধি না কবলে আজ এটা কাল ওটা নিযে আপনাব দ্বিধা দেখা দেবে, আব এ-ধবণেব এলিমেণ্টবা পার্টির মধ্যে কনফিউশন ক্রিযেট করবে। **Try to realize, K M is taller than chairman Mao because he is standing on the shoulder of chairman Mao**

—এসব বলছিস কী ববীন?-

—হ্যাঁ কমবেড, এইখানেই আপনার রিয়ালাইজেশন্ এব সঙ্গে সংগ্রামী কমরেডদের বিযালাইজেশনেব পার্থক্য। আপনি চমকে যাচ্ছেন, অথচ গত

বিশ বছর মাটি কামড়ে পড়ে থেকে যে-কমরেড শ্রীকাকুলাম গড়ে তুলেছেন তিনি বলছেন—কেতুদা is the authority of ব্রহ্মাণ্ডম্। কংগ্রেসেও অথরিটির প্রশ্নে বিহার ইউ পি-র দু'একজন বিরোধিতা করেছিল। আজকে বিহার ইউ পি-র দিকে তাকিয়ে দেখ, কোন সংগ্রাম নেই। আর মেদিনীপুরের লড়াইয়ের নেতা সেখানে বলছেন, যদি কেতুদা একদিকে আর পুরো কেন্দ্রীয় কমিটিও আরেকদিকে হয়, তাহলেও উনি কে. এমের সঙ্গেই থাকবেন। আজকে কোন এলাকায় সংগ্রাম গড়ে উঠবে কি উঠবে না, তা নির্ভর করছে কে. এমকে তুমি নিঃসর্তে মানো কিনা তার ওপর।

হঠাৎ গোবিন্দ এসে উঁকি দেয়, হাতে একটা পাইপগান। রবানকে উদ্দেশ্য করে বলে—কমরেড মিটিং সংক্ষেপ করুন, গুঞ্জনঘাট থেকে আমাদের এক কমরেড খবর দিয়ে গেল, কয়েকজন সন্দেহজনক লোক নদী পার হয়ে এদিকে এসেছে। সাবধান হওয়া দরকার।

—ঠিক আছে কমরেড, আমরা এক্ষুণি শেষ করছি।

জহরের যুক্তিগুলোকে ফেলে দিতে চাইছে না বিষ্ণু। কিন্তু বারবার ওর একটা কথাই মনে হচ্ছে, যদি কে. এমের লাইনে এত গণ্ডগোলই থাকবে, তাহলে পিকিং রেডিও, মানে চীনের পার্টি তাকে এত প্রচার করবে কেন?

—কমরেড, এই বাজে বিতর্কে নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই। আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। হয় আমরা শত্রুকে খতম করবো নাহলে শত্রু আমাদের খতম করবে। এ-প্রসঙ্গে শেষ কথা হচ্ছে, কমরেড জহর জেলা-সম্পাদক হিসেবে পদত্যাগ করার সময় যে-চিঠি রাজ্য-কমিটিকে লিখেছিলেন, মনোজদার সঙ্গে আমার সে ব্যাপারে কথা হয়েছে। কমরেড, আমরা আশা করি, উনি আবার ভালভাবে ভাবনা-চিন্তা করবেন। তবে পার্টির তরফ থেকে তাঁকে বলা হচ্ছে যে গেরিলা-যুদ্ধই শ্রেণীসংগ্রামের একমাত্র রূপ নয়, বেআইনি ও আইনের লড়াই যুক্ত করা, জমি-দখল ও অন্যান্য অর্থনৈতিক আন্দোলন করা ইত্যাদি ওনার চিঠির বক্তব্য বিষয়গুলি পার্টির চিন্তাধারাবিরোধী। এটা কে. এমের পার্টি, যিনি তাঁকে বিনাসর্তে মনেবেন না, তাঁকে পার্টিতে জায়গা দেওয়া হবে না।

জহর কোন কথা খুঁজে পায় না। ওর কিরকম হতাশ লাগে। বিষ্ণুর দিকে তাকায় জহর। বিষ্ণু মাথা নামিয়ে নেয়। জহর একটা বিড়ি ধরিয়ে কোন্ চিন্তার অতলে তলিয়ে যায়। মিটিং চলতে থাকে। ভাসা ভাসা কানে আসে জহরের। অশোক বেল পেতে পারে, নেবে কিনা, পার্টির কাছে জানতে চেয়েছে।

—আমরা কমরেড অশোকের জন্য গর্বিত। জেলের ভেতরেও কমরেড উদ্যম না হারিয়ে কাজ করছেন। এখনো অব্দি আমরা অন্ততঃ দু'জন গেরিলাকে পেয়েছি, যাদের অশোক জেলে বসে রাজনীতি দিয়েছেন। বাইরে বেরিয়েই তারা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। নরেশ, তুই অশোককে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর যেন বেল না নেয়, পার্টির নির্দেশ আছে যে আমরা এই আইন মানি না, কাজেই এর সাহায্যে আমরা বেরোবার চেষ্টা করবো না। আমরা আমাদের কমরেডদের জেল-ভেঙেই বার করে আনবো। ডিভিশনও আমাদের কমরেডরা নেবে না। কারণ মধ্যবিত্ত ও কৃষক-কমরেডদের মধ্যে এতে দূরত্ব তৈরি হবে।

জহরের আর প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে না। যদিও ও নিজের চিন্তার সঠিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নয়, সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না তাও সত্যি, কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, মতাদর্শগত সংগ্রাম পার্টির আত্মা, পার্টিকে এগোতে হয় বাম ও দক্ষিণ উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করে—এ-ধরণের হাজারো সত্যকে ও অস্বীকার করতে পারবে না। আজ গ্রামের লড়াই এগোচ্ছে না, তাই শহরে লড়াই শুরু করছে। কাল শহরের লড়াই মার খাবে আর সমস্ত কর্মীরা মরবে, নয়ত জেলে যাবে। তারপর হয়ত জেলেই লড়াই শুরু করবে। রবীনের বক্তব্যের মাঝখানেই হঠাৎ বলে ফেলে জহর—কমরেডস্, আমার পক্ষে আর এই পর্যায়ে এখানে কাজ করা সম্ভব হবে না। আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। যদি সত্যোপলব্ধি হয়, আশা করি, আগামী দিনে আবার ফিরে আসবো।

অন্য সবাই যেন এটার জন্য প্রস্তুত ছিল। শুধু নরেশ আর বিষ্ণু এ-কথার আকস্মিকতায় চমকে উঠল। নরেশের মনটা খারাপ হয়ে যায়, প্রথম দিন থেকে জহর আর নরেশই এ-জেলায় কাজ শুরু করেছে। বিষ্ণুর কেমন যেন অসহায় লাগে। কিন্তু ফেরার কথাও ও ভাবতে পারছে না। কী করবে ফিরে গিয়ে? বিষ্ণু ঠিক করে, রবীনদের কথা মত অক্ষরে অক্ষরে কে এম-কে অনুসরণ করে কিছুদিন কাজ করে দেখবে, সত্যিই তাতে কাজ এগোয় কিনা।

—পার্টির পক্ষে কী ফেরার ট্রেন-ভাড়া দেওয়াটা সম্ভব হবে? আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে। আর টাকা দশেক দিলেই হয়ে যাবে।

সবাই রবীনের দিকে তাকিয়ে। রবীন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।—ঠিক আছে।

মিটিং শেষে ওরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বেরোয়। নরেশ, নৃপেন ও

জহর এক সঙ্গে ঘাটের দিকে যায়। ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ওপারে একটু দূরে শহরের আলোগুলো জোনাকির মত জ্বলছে। ঘাটের পাড় বেয়ে নেমে পড়ে ওরা। কুল কুল করে সরু মহানন্দার ধারা বয়ে যাচ্ছে। হাঁটু জল পেরিয়ে নদীর বুকে বিশাল চরের ওপর হাঁটতে থাকে। জহরের ভাবতে কষ্ট হয়, এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবে। শত-সহস্র বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে। টুডুদের মত কৃষক-কমরেডদের ও শুধু এইটুকু বলে এসেছে, পার্টি যা করছে, তার সঙ্গে জহরের মতে মিলছে না। ও হয়ত কিছুদিনের জন্য বাইরে যাবে। তবে ফিরে ও আসবে টুডুদের কাছে।

মহানন্দার বুকে এই বিশাল চরের বালিয়াড়ি দেখে হঠাৎ চিন্তা হয় জহরের। নদীটা তো গতিপথ বদলাবে মনে হচ্ছে। নৃপেন জহরকে জিজ্ঞেস করে—কোথায় থাকবে রাতে ?

— কেন ? আমার শেল্টার, মলয়দের ওখানে।

—মলয় অ্যারেস্টেড। শেল্টারের অবস্থা খুব খারাপ। এত ছেলেকে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হচ্ছে। নরেশ চিন্তিতভাবে বলে।

—তাহলে ? নরেশকেই জিজ্ঞেস করে জহর।

—আজকে রাতের ট্রেনেই চলে যাও। নৃপেন সমস্যার সমাধান করে দেয়।

—ট্রেন তো ভোর তিনটেয়, এখন সবে আটটা। স্টেশনে গিয়ে বসে থাকলে তো আর ·

নরেশ বোঝে জহরের সমস্যাটা। এখনও মালদা জেলাতে সবচেয়ে ওয়ান্টেড জহর। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে কটা ছেলে ধরা পড়েছে প্রত্যেককে জেরা করছে জহর সম্পর্কে।

—কিভাবে যাবে, ভেবেছো ?

—আমি তো ভেবেছিলাম, ভোর রাতে শহরের বাইরে চলে যাবো। তারপর মানিকচকের বাস ধরে রাজমহল হয়ে যাবো। কিন্তু রাতটা তো কোথাও থাকতে হবে।

—একটা জায়গায় চেষ্টা করা যেতে পারে। সেটা তুমিই পারো। মিনুদের ওখানে। অশোক ধরা পড়ার পর থেকে কেউ যায় নি। অবশ্য মিনুর বাবার যদি অ্যাকশন দেখে ভয় না হয়ে থাকে তবেই হতে পারে।

কতদিন মিনুদের বাড়ি যায় নি জহর। সোনার কথা মনে পড়ে। কলকাতায় গিয়ে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, ভাবে। জহরের নিজের কাছেও এটা

বিস্ময়কর মনে হয়। সব সংগ্রামী কমরেডরা এইসব লাইন মেনে নিচ্ছেন কি করে? সত্যিই ওর নিজের কিছু বুঝতে ভুল হচ্ছে না তো?

নরেশের কাছ থেকে জহর মোটামুটি কোন্ রাস্তায় গেলে বিপদ কম, জেনে নেয়। নরেশ আর নৃপেনের কাছ থেকে বিদায় নেয়। নৃপেন জহরকে বলে—একটা ফ্রেণ্ডলি অ্যাডভাইস দেবো—keep your mouth shut or else you will invite trouble.

২৭

বড় ক্লান্ত আর হতাশ লাগে মিনুর। সমরের বাড়ি থেকেও কোন খবর পেল না। অথচ সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অশোকদের পরশুদিন বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে ট্রান্সফার করে দেবে। মিনুর হঠাৎ মনে হয় পেছনে যে লোকটা আসছে তাকে শেয়াদের বাড়ি থেকে বেরিয়েও দেখেছিল। খোঁচড় নাকি? ফলো করছে? মিনু সতর্ক হতে চায়। ডানপাশে ওয়াটার ওয়ার্কসের গলিতে ঢুকে পড়ে। দ্রুত পা চালায়। বাঁক নেওয়ায় কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখা যায় না। মিনু নিশ্চিন্ত হতে চায়। হয়ত মনের ভুল। স্নায়ুর ওপর কদিন ধরে এত চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। গোবিন্দদা খবর পাঠিয়েছিল আগামী-কাল জেল গেট অ্যাকশন করে বন্দীদের মুক্ত করে আনা হবে। সেই অনুযায়ী জেলের ভেতরে বাইরে সব প্রস্তুতি নেওয়ার কথা। সেই গোবিন্দদাই শহীদ হয়ে গেল।

অথচ গোবিন্দর কথার ওপর নির্ভর করেছিল সবাই। 'আমাদের কমরেডদের আমরা ছিনিয়ে আনবই।' মিনু পেছনে তাকায়। লোকটা বাঁকের মাথায়। নির্ঘাৎ পিছু নিয়েছে। কিন্তু কোত্থেকে ফলো করছে, ভাবতে চেষ্টা করে মিনু। প্রথমে ভারতীর বাড়ি গিয়েছিল। এই ভেবে যে যদি ভারতীর সূত্রে নরেশদার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা যায়। নরেশদার বাবা বললেন ভারতী আসামে মামা বাড়িতে বেড়াতে গেছে। আর নরেশ নাকি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে দিল্লী গেছে। - এ বাড়িতে আর এসোনা বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। নরেশদার কথাটা মিনু বিশ্বাস করে নি। আর ভারতীকে হয়ত বাড়ি

থেকেই জোর করে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। নরেশদা নিশ্চয়ই এখানেই আছে, কিন্তু কিভাবে যে যোগাযোগ করা যায়?

লোকটা বড় বড় পা ফেলে প্রায় মিন্নুকে ধরে ফেলেছে। মিন্নুর শিরদাঁড়ায় একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি শির শির করে নামে।

ভারতীর বাড়ি থেকে কেয়ার বাড়ি গিয়েছিল। বাড়িতে শুধু কেয়ার মা ছিলেন। ওর বাবা কাকারা থানা উকিল ছোটাছুটি করছে। গতকাল রাতে কেয়াকে ধরে নিয়ে গেছে: মিন্নু অবশ্য জানতো না। কেয়ার মা হাউ-হাউ ক'রে কাঁদলেন—তোরা কেন এপথ ধরলি মা। আমার মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে, তোরা বাঁচা। আমার মেয়েটার ওপর অত্যাচার করবে। তোরা একটা কিছু কর। ওই পুলিশগুলো যে মানুষ নয় রে।

করতে তো চায় মিন্নু। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারছে না। লোকটা সেই দশ বারো হাত দূরত্ব বজায় রেখে পেছন পেছন আসছে। মিন্নুর হঠাৎ মনে হয় একটা রিক্সা নিলে হয়ত লোকটাকে কাটানো যেত। কিন্তু একটাও পয়সা নেই সঙ্গে। সামনের বাঁদিকের গলিতে শিখাদের বাড়ি। ওদের ওখানে গেলে হয়। পরক্ষণেই মনে হয় লোকটা নিশ্চয়ই—নরেশদাদের বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকেই ফলো করছে। নরেশদার বাড়ির ওপর নজর রাখতেই পারে। অলরেডি অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে মিন্নু। কেয়ার বাড়ি, সমরের বাড়ি, আর কারুর বাড়ি যাওয়া একদম উচিত নয়। লোকটা কি শুধু ও কোথায় যায় না যায় দেখার জন্যেই ফলো করছে না কি ওকেও ধরার কোন মতলব আছে। সাদা পোষাকে শহর গিজ গিজ করছে।

গোবিন্দদের অ্যাকশানের পর থেকে পুলিশ সি. আর পিরা সারা শহর তোলপাড় করছে। লোক মুখে শোনা কথাগুলো মিন্নুর মাথায় ঝিলিক দিয়ে যায়। শিরদাঁড়া টান টান করা সাহস। রথবাড়ি মোড়ে সি. আর. পি ক্যাম্প। তখন রাত্রি দুটো। খালি হাতে পাঁচটা ছেলে ঝাঁড়িয়ে পড়ল চারটে সি. আর. পি-র ওপর। দুটো জখম করেই কাজ হয়েছিল। দখলে চার চারটে রাইফেল। দুর্ভাগ্য ওদের, ঠিক সেই সময়েই একটা পুলিশের গাড়ি যাচ্ছিল ওখান দিয়ে। গাড়ি থেকেই ফায়ার করল। সামনে রেল লাইন, পেরোতে পারলেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে যাবে। লাইনের ওপরে উঠে পড়ে ওরা। নৃপেনের পায়ে একটা গুলি লাগে। গোবিন্দ নৃপেনকে ধরে তোলে। বাকি তিনজন ছুটে এগিয়ে গেছে অনেকটা। গোবিন্দ নৃপেনকে ধরে ধরে পাশের ক্ষেতের মধ্যে রাত পাহারার

আটচালায় তোলে। শোনা যায় সি. আর. পি-রা ওই পুরো এলাকাটা ঘিরে ধরে ঘেরাও ছোট করতে করতে ওদের ধরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছিল।

মিনু ভেবে দেখে বাড়ি ফেরাটা এখন ঠিক হবে না। নিজের আস্তানা চিনিয়ে দেওয়াটা খুব বোকামি হবে। অন্য কারুর বাড়ি যাওয়াও উচিত নয়। অথচ আর শরীর চলছে না। সেই দুপুর থেকে শহরের এমাথা ওমাথা চষে ফেলেছে। শারিরিক আর মানসিক ক্লান্তি মিলে ওর কোথাও গা ছেড়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ও বুঝতে পারছে পার্টির সঙ্গে শুধু ওর নয় ওর মত কর্মী ও সমর্থকদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পরিচিত সংগঠকরা হয় ধরা পড়েছে না হলে আত্মগোপন করে আছে। অশোকদের ছাড়িয়ে আনার প্রোগ্রাম নেওয়া হবে বলে মনে হয় না মিনুর। অথচ বহু আজে বাজে অ্যাকশন হচ্ছে। গতকাল একটা ট্রাফিক পুলিশ খতম হয়েছে। কারা করছে বুঝতে পারছে না মিনু।

অশোক নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাছে থাকত না, তবু মনে হত ওই জেলের প্রাচীরটার ওপারেই তো আছে। জহরদা সব ভুল হচ্ছে বলে চলে গেছে। চেনা লোকগুলোর সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকছে না। মিনুর কেমন যেন হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি হয় আর দরদর করে ঘামতে থাকে। পেছন ফিরে দেখে নেয় লোকটা তখনও আসছে কিনা। যদিও ও পিঠের ওপর শকুনের নজরটা অনুভব করতে পারছিল তবুও দেখে নেয়। না দেখতে চাওয়ার আগ্রহ নিয়েই দেখে, ঠিক তেমনি ভাবে একই রকম দূরত্ব বজায় রেখে আসছে। সাদা শার্ট, ধুতি। কিন্তু এখন তাহলে কোথায় যাবে মিনু। কোন একটা আশ্রয়। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সামনের রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। আজকাল সন্ধ্যের পর বড় একটা কেউ নেহাৎ দায় না পড়লে বাইরে বেরোয় না। যদি হঠাৎ হাত চেপে ধরে, যদি একটা জীপ এসে দাঁড়ায় আর তাতে তুলে দেয়, যদি দু দশ জনে মিলে অত্যাচার করে, না মিনু ভাবতে পারছে না। মিনুর বাঁচাও বাঁচাও বলে চীৎকার করতে ইচ্ছে করে। ও জানে সত্যি সত্যি চীৎকার করলেও আশ-পাশের বাড়ি থেকে একটা মানুষও এগিয়ে আসবে না। মিনুর মাঝে মাঝে বিরাট একটা মিটিং ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—ওহে মানুষেরা তোমরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছো ঘুমোচ্ছো, আর কোন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে নয়, তোমাদেরই সুদিনের জন্য দেখ এই ছেলেরা লড়ছে জেলে যাচ্ছে। এসো তোমরাও এগিয়ে এসো, এদের পাশে দাঁড়াও।

অন্ধকারে লোকটার কাটা কাটা চর্বি মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু

সাদা পোষাকটাই বোঝা যাচ্ছে যে এখনো পেছন পেছন আসছে। মিনুর কান্না পায়, একবার মনে হয় লোকটাকে বলে—তোমাদের কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি যে আমাকে এমন জ্বালাচ্ছো। আমি তো আর কিছু চাইছি না, শুধু মানুষটা জেলের ভেতর দম আটকে মরছে তাকে বাইরে দেখতে চাইছি। আর কি অপরাধ করেছি?

উদ্দেশ্যহীন হাঁটার পথে মিনুর হঠাৎ খেয়াল হয় দীপুদের বাড়িটা কাছেই। ওদের বাড়ি গেলে তো আর কিছু ক্ষতি নেই। দীপু তো আর পলিটিক্স করে না।

হঠাৎ এতদিন বাদে দরজা খুলে মিনুকে দেখে আশ্চর্য হয় দীপু। কি বলবে ভেবে পায় না, কেন কে জানে বলে—মা বাড়িতে নেই। কীর্তন শুনতে গেছে।

- ও। একটু বসবো।

—এসো।

মিনু ঘরে ঢোকার আগে পেছন ফিরে একবার দেখে নেয়। লোকটা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে। মিনুর চেহারার উদ্বেগ ক্লান্তি লক্ষ্য করে দীপু।

মিনু জল চৌকির ওপর চুপচাপ বসে থাকে। হিসেবে কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। এমন তো হবার কথা ছিল না। হঠাৎ ওর মনে হয় বাবা যে বলে না -

পরিত্রাণায় সাধুনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মং সংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে।

এটাই বোধ হয় ঠিক। কোন মহাপুরুষ না জন্মালে এ অবস্থা বদলানো সোজা নয়।

—বাড়ির সবাই ভাল?

—উঁ। নিজের চিন্তায় হারিয়ে গিয়েছিল মিনু। —হ্যাঁ, ভাল।

- হঠাৎ এলে?

—না মানে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে যাই।

—ও। তোমার এরকম উস্কো-খুস্কো চেহারা দেখে ভাবলাম কোন বিপদ-আপদ হয়েছে।

মিনু চুপ করে থাকে। চৌকি থেকে নেমে পাশের জানলাটা দিয়ে সামনের রাস্তাটা দেখার চেষ্টা করে। রাস্তাটা ঠিকমতো দেখা যায় না, তাই বুঝতে পারে না লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে কিনা।

—তোমাদের পলিটিক্সের কী খবর?

মিনুর প্রচণ্ড রাগ হয়, কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

—দেশ মুক্ত হতে আর কদিন?

মিনুর কেমন যেন ঘেন্না লাগে। মনে হয় দীপু যেন ব্যঙ্গ করছে। দরজার দিকে এগোয় মিনু।

—যাচ্ছো?

—হুঁ।

—এই রাত্রে একা একা যাবে? চারদিকের যা অবস্থা।

মিনু দরজা খুলে রাস্তায় পা রাখে।

—এগিয়ে দেবো।

মিনু এক মিনিট কি ভাবে তারপর বলে—চলো।

—দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে দিই।

মিনু রাস্তার এদিক ওদিক দেখে নেয়। লোকটাকে না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বুক থেকে যেন একটা ভারি পাথর নেমে যায়। আর দীপুর প্রশ্নটার নিজের মনের কাছেই উত্তর দেয়—তোমরা সবাই ফলটা আশা করছো। ফল ফলতে দরকার গাছের। আর গাছ হয় বীজ থেকে। কিন্তু শুধু বীজ পুঁতলেই ফলবান গাছ হয় না। বীজের বিকাশের জন্য চাই উপযুক্ত জমি। তাই আগে আমরা আশা করবো আর ফল পাচ্ছি না বলে হাহুতাশ করবো না জমিটা তৈরি করবো?

অশোকের কাছে শোনা কথাটা মনে করে হালকা বোধ করে মিনু।

—কেন সারাক্ষণ পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করছিস? খোকনকে বকে মিনু। মা মারা যাবার পর থেকেই খোকনের এই এক রোগ হয়েছে। আগে মার কাছে বসে বসে তবু একা একা খেলত! এখন মিনুকে কোন সময় ছাড়তে চায় না।

বাইরে সাইকেলের ঘন্টি বাজে। মিনু ভাবে, নিশ্চয়ই পেছনের দর্জিদের বাড়িতে কেউ এসেছে! ওদের বাড়িতে এমনিতেও লোকজন খুব একটা কেউ আসে না, তারওপর সাইকেলে কেউ আসে বলে তো মনে পড়ে না মিনুর। রাজু এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়। মিনু মেঝেতে বসে খোকনকে প্যান্ট পরাচ্ছিল, হঠাৎ রাজুকে দেখে চমকে ওঠে।

—মরি নি রে, বেঁচে আছি।

স্মৃতির সোপানের শীর্ষ থেকে কেউ যেন হঠাৎ ধাক্কা দেয় মিনুকে। অশোক। অশোক নেই।

—জানি, দু মাস আগে ছাড়া পেয়েছিস। মনে আছে তবু আমাদের কথা।

—সবার কথাই মনে আছে রে। শরীর ভাল নেই, তাই খুব একটা বেরোই না।

—বোস। কী হয়েছে?

—বলতে শুরু করলে ইতিহাস হয়ে যাবে।

—বলই না।

—হাজতে ঝুলিয়ে রেখে কয়েকদিন ধরে পায়ের তলায় মেরেছিল। তার থেকেই স্পাইনাল কর্ডের একটা অসুখ হয়েছে।

দু'জনেই চুপ করে যায়। এসব কথায় অতীতের দিনগুলো বড় চোখের সামনে এসে যায়।

—মেসোমশাই নেই বাড়িতে?

—না।

—সিগারেট খাবো?

—তুই আবার কবে ধরলি?

—জেলখানায়। বহরমপুরে।

—কদ্দিন ছিলি তুই ভেতরে ?

—মালদা জেলে দু'মাস। তারপর তো বহরমপুরে—এই ধর মাস ছয়েক।

আবার দু'জনেই কথা খুঁজে পায় না। দামাল দিনগুলো স্মৃতির কোঠায় দাপিয়ে বেড়ায়, আর খোকনের মত মিনুর পায়ে পায়ে এক অবসন্ন বিষাদ ঘুর ঘুর করে।

—কার কী খবর জানিস ? আমাদের এখানকার, কলকাতার ?

—কার খবর জানতে চাস, বল ?

সকলের। বরুণ, রমেনদা ?

—রমেনদা জেলে, বহরমপুরে। আর বরুণের কথা আর বলিসনা। রোজ সন্ধ্যেবেলা পার্কে বসে গাঁজা টানে।

—বাইরের আর যারা ছিল, তাদের কার কী খবর ?

—বিষ্ণুদা, দেবেনদা বহরমপুরে। রবীনদার খবর কেউ জানে না। কেউ বলে মধ্যপ্রদেশে, কেউ বলে দিল্লীতে আছে। স্বপনদা, মানে আমাদের জহরদা এখনও প্রচণ্ড ওয়ান্টেড। শুনেছি কলকাতায় আছে এবং রাজনীতি করছে। আর রজত বলে একজন ছিল, তুই চিনতিস ?

—না। কেন ?

—আমিও ভাল চিনতাম না। মাঝখানে ফিরে গিয়েছিল। এখন শুনছি আবার নাকি এখানকার গ্রামেই আছে।

- কী করছে গ্রামে ?

—জানি না।

—কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল, না রে! স্বগতোক্তির মত বলে মিনু।

রাজু চুপচাপ সিগারেটে টান দিতে থাকে। এই বিপুল আত্মত্যাগ, প্রচণ্ড আবেগ, মানুষের দুর্নিবার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, এখন বসে ভাবলে যেন স্বপ্ন দেখছি মনে হয়।

—গৌতমদাকে জেলখানায় দেখলে তুই অবাক হয়ে যেতিস।

মিনু রাজুর কথা শুনছে, হঠাৎ খেয়াল হয় গৌতম, মানে অশোক। অশোক ধরা পরার পর জেনেছিল, ওর নাম গৌতম। তার মানে, রাজু অশোকের কথা বলছে।

—আমি যাওয়ার আগে থেকেই ওখানে অনেকদিন আছে। অতবড়

জেল-ভর্তি আমাদের ছেলে। এমনকি চোর-পকেটমারও যারা ছিল তারাও অনেকে আমাদের সমর্থক হয়ে গিয়েছিল। গৌতমদা সবার মধ্যে দারুণ পপুলার। গৌতমদা ভাল গাইত, জানস। রোজ সন্ধ্যেবেলা গুণতির পর আমাদের সেলে ঢুকিয়ে দিত। তারপর গৌতমদাদের সেল থেকে শুরু করত গান। ওরা এক সেলে চারজন ছিল। বর্দ্ধমানের দু'জন আর বীরভূমের একজন। সে কী দরাজ গলায় গান! জেলখানার সন্ধ্যে, টিম টিম করে বাতি জ্বলছে, কারুর কোন কাজ করার উপায় নেই। গৌতমদাদের গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে—'তরাই জ্বলছে গো, আর জ্বলছে আমার হিয়া…', আরো অনেক অনেক গরাদের ফাঁক দিয়ে কয়েক শো কমরেড গলা মেলাচ্ছে। কোন দিন বা শুধু গৌতমদারাই গাইছে—'…জীবন উৎসর্গ করে সবহারা জনতার তরে মরণ যদি হয়/তবে তাহার ভারে হার মানে ঐ পাহাড় হিমালয় ,' আর কয়েকশো বন্দী গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে তারাভরা একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে শুনছে।

মিনু যেন চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।

—কোন দিন বা আমরা সবাই আমাদের সমস্ত আবেগ আর বিশ্বাস নিয়ে গেয়েছি—'কারার ঐ লৌহকপাট/ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট ‥' গরাদের শিকের মধ্যে দিয়ে শত শত মুষ্টিবদ্ধ হাতে শ্লোগান দিয়েছি—সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লব জিন্দাবাদ। গৌতমদারা ইণ্টারন্যাশনাল ধরলেই আমরা বুঝে নিতাম, সে দনের মত শেষ। জেলখানার প্রাচীর উপচে আমাদের গানের সুর বেরিয়ে পড়ত—
…ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার জীবন মরণ করি পণ….

রাজু তুই চুপ কর। মিনুর রাজুর মুখ চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। ওর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—রাজু তুই জানিস না, অশোক আমার কতখানি জুড়ে আছে।

—জানিস মিনু, শুধু একদিন আমরা ইণ্টারন্যাশন্যাল গাই নি! ১৫ই ডিসেম্বর। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর তিন মাসেই আমাদের দশ বারোজন কমরেডকে হয় ছেড়ে দেবার নাম করে, না হলে অন্য জেলে ট্রান্সফারের নাম করে পুলিশ নিয়ে গেছে। পরে আমরা বাইরে থেকে খবর পেয়েছি, তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। তাই আমাদের জেলের পার্টি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এরপর এমন চেষ্টা করলে বাধা দেওয়া হবে। সন্ধ্যাবেলার গুণতির পর সেদিন আমাদের মত অনেককেই সেলে বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর

আটজন কমরেডকে আলাদা ডেকে বাকিদের সেলে লক আপ করতে গেলে তারা লক আপে যেতে অস্বীকার করে। একজন ওয়ার্ডার হঠাৎ হুইসিল বাজায়। চতুর্দিকে ওয়ার্ডারদের হুইসিল বাজাতে শুরু করে। সেণ্ট্রাল টাওয়ারে ঘণ্টি বেজে ওঠে। পাগলি। একটানা ওঠানামার সুরে সাইরেন বাজতে থাকে। আমরা দেখি হঠাৎ লাইট অফ হয়ে যায় আর মশাল হাতে ঝড়ের বেগে সি. আর পি-রা ঢোকে। বেধড়ক লাঠিগুলি চালাতে শুরু করে। গৌতমদারা সেলের দরজায় বেডিংগুলো দিয়ে একটা ব্যারিকেড মত করতে চেষ্টা করে। বীরভূমের কমরেডটির মাথায় লাঠি পড়ে—ফট্ করে একটা আওয়াজ হয়। তার মাথাটা ধরতে গিয়ে দু'ফাঁক হয়ে যাওয়া খুলির মধ্যে হাত ঢুকে যায় গৌতমদার। তখন নাকি গৌতমদা ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই সি আর পি-টার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে সেটাকে খতম করে। আরও দু-একটাকে মারে। এক ঝাঁক সি আর পি ঝাঁপিয়ে পড়ে, গৌতমদাকে ধরে বেদম পিটিয়ে মাটিতে ফেলে গলায় লাঠি চেপে ধরে তার ওপর দু'দিকে থেকে দু'জন···

- চুপ্ কর, রাজু, চুপ কর। চীৎকার করে ওঠে মিনু।

—না:, এই দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, গৌতমদারা বাঘের মত লড়ে ···আর সেলে বন্দী অবস্থায় আমরা কয়েকশো ছেলে····

গলা ধরে যায় রাজুর। খোকন এতক্ষণ দিদির কোলের কাছে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিল। রাজুর ফোঁপানি শুনে খোকনও দিদির কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে ওঠে। মিনুর চোখ শুকনো, বুকের ভেতরে শুধু উত্তাল সমুদ্র আছড়ে পড়ছে, খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দি ত দিতে বলে মিনু,—এই বোকা ছেলে, কী হয়েছে? কিচ্ছু হয় নি।

রাজু সামলে নেয় নিজেকে। নিজের অক্ষমতায় লজ্জায় যেন আজও জ্বলছে।

—গৌতমদার ঘরের একটা ছেলে বেঁচে গিয়েছিল। তারই মুখে শুনেছি সব। ভোররাতের মধ্যে পুলিশের ভ্যানের গহ্বরে একশো পঞ্চাশটা লাশ বেরিয়ে গেল। সারা বহরমপুরের মানুষ এসে ভীড় করল জেলগেটে। নাঃ আর বলবো না।

রাজু চুপ করতে চেষ্টা করে। পারে না।

– কী হয় জানিস তো, আমরা সমাজ থেকে একদম আলাদা হয়ে গিয়েছি। বাড়িতে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের থেকে একদম আলাদা।

সবাই দেখি শুধু ভোগের হিসেব করছে। তাই মন খুলে কথা বলার লোক পেলে চুপ করে থাকতে পারি না।

রাজু আরেকটা সিগারেট ধরায়।—তোর কলেজ কখন ?

— নেই।

—ছুটি ?

—না রে, ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন ?

— মা মারা গেল। খোকন সারাদিন কার কাছে থাকবে ? তাছাড়া পয়সাকড়িরও সমস্যা আছে।

—ও! আজ উঠি রে।

আসিস কিন্তু মাঝে মাঝে।

—আসবো।

রাজু বেরিয়ে গেলে মিনুর খেয়াল হয়, অনেক বেলা হয়ে গেছে। খোকনকে স্নান করিয়ে খাওয়াতে হবে। নিজেরও স্নান হয় নি। বাবা-নাড়ু-সন্তুর খেয়ে যাওয়া এঁটোবাসনগুলোও পড়ে আছে। রাতে আবার আজ পরেশের আসার কথা আছে। আসাম-বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে পরেশ। এখনও ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হয় নি। কনফার্ম হলে শ'দুয়েক টাকা মাইনে পাবে।

কাজকর্ম সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় মিনু। একদম খেতে ইচ্ছে করছিল না। ভাতে জল দিয়ে রেখে দিয়েছে। খোকন খেয়ে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপুর বেলা সারা পাড়াটা চুপচাপ। কোথায় একটা কাক একটানা ডেকে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে মিনু। তবুও ঘুম আসে না। কী করবে, ভেবে পায় না। খোকনের গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দেয়। আলনার নীচে এককোণে অশোকের বইয়ের ব্যাগটার দিকে চোখ পড়ে। অশোক ধরা পড়ার কিছুদিন বাদে ওর বাবা-মা নাকি এসেছিলেন ওকে বেলে ছাড়বার ব্যবস্থা করতে। মিনু অবশ্য তখন জানত না। পরে শুনেছিল। তা নাহলে অশোকের জিনিসগুলো দিয়ে দিতে পারতো। ওদের কলকাতার ঠিকানাও জানে না কেউ। মিনু অশোকের ব্যাগ থেকে অশোকের কবিতা লেখার খাতাটা বার করে। বইগুলো সবই পড়া, দুটো বাদে—Problems of Leninism, আর একটা যেন কী একটা অদ্ভুত নাম।

বহুবার পড়েছে কবিতাগুলো। অবারও পাতা ওল্টাতে থাকে মিনু। এই লেখাগুলো ওর একান্ত নিজের।

এখন রাত—অন্ধকার,/হাজার মানুষেব চোখে ঘুম

তবু কারা বাত-পাহারায় ব্যস্ত যাতে ফাঁকি না দিতে পারে দিন।···

মিনুব হঠাৎ অ্যালার্ম শুনে ঘুম ছুটে যাওয়ার মত মনে হয়—অশোক কবিতা লিখেছিল সমস্ত মানুষেব জন্য, শুধু মিনুর জন্য তো নয়। এগুলো বস্তা-বন্দী করে ফেলে বেখে ভীষণ অন্যায় করেছে মিনু। অশোকের লেখা ছাপার মত কি একটাও কাগজ নেই? নিশ্চয়ই আছে। খবর নিতে হবে। মিনু কবিতার খাতা সামনে খুলে অশোকের জগতে হারিয়ে যায়।

মানুষেব চোখেব পানে তাকালে
দেখবে গোলাভরা ফসল—
আগমনী সুব ছাপিয়ে
কোথায় উৎসবেব বাজনা বাজছে
যে-উৎসবে বিসর্জন নেই।

২৯

বাজারের ব্যাগটা নামিয়ে রেখেই নিবারণবাবু খুশীর সুরে বলেন—আজ বাজারে কার সঙ্গে দেখা, জানিস? সুজিত রে, আমাদের সুজিতেব সঙ্গে।

সুজিতদা এখানে। বদলি নিয়ে চলে গিয়েছিল তো।

—বুঝলি তো কে, আরে তোর কাছে আসতো, মেসে থাকতো এইখানে।

—বুঝেছি।

—প্রমোশন পেয়ে এখানে বদলি হয়ে এসেছে। আমি জানতাম ছেলেটা উন্নতি করবে। ট্যাংক ইমপ্রুভমেণ্ট অফিসার হয়ে গেছে। এখন আর মেসে থাকে না। মকতুমপুরের দিকে বাসা নিয়েছে।

নিবারণবাবুর চোখেমুখে উচ্ছ্বাস। মিনু বাজারের জিনিসপত্র বার করতে থাকে। আজকেও মাছ আনে নি। ভালই হয়েছে, ছোট ছোট মাছগুলো কুটতে এত বিরক্তি লাগে।

—ওর মা'ও এসেছে। আমি বললাম, তা আর কী, এবার বিয়ে-থা করে ফেল। তা ছেলে বলে কি—মা-ও তাই বলছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

ডাল নামাতে নামাতে শোনে মিনু, বাবা বলেই চলেছে—বারবার বলল, ওদের বাড়ি যেতে। সবাইকে নিয়ে যেতে বলেছে।

মিনু হাত চালিয়ে সব্‌জি কুটছে, উনানে আঁচ বয়ে যাচ্ছে।

—আমি বললাম, তুমি এসো আগে। বলেছে, রবিবারে আসবে, বুঝলি।

মেয়েকে নিরুত্তর দেখে উচ্ছ্বাস চুপসে যায় নিবারণবাবুর। এ এক আজব মেয়ে হয়েছে। দীপু তো আসা-যাওয়া বন্ধই করেছে, সেই সোনার বন্ধুরা যখন আসত টাসত, তখন থেকে। আর ওই অশোক ছেলেটা নাকি বাংলা অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। সে তো নাকি জেলে মারা গেছে। ওঃ, কী বাঁচাই বেঁচে গেছেন, মাঝখানে তো নিবারণবাবু ভয়ে কাঁটা হয়েছিলেন। ওনাকে নিয়েও না পুলিশ টানাপোড়েন করে। সেরকম কিছু হয় নি অবশ্য। সোনার মত একটা ব্রাইট ছেলে জেলে পচছে। এদের মত ছেলেরা কোথায় আই এ এস হবে, দেশ চালাবে; তা নয়, ওঁচা কতগুলো লোক এসে ওপরে বসছে। আজকালকার ছোকরা অফিসারগুলোকে দেখেন তো। এক কলম ঠিক ইংরাজী অব্দি লিখতে পারে না।

এতদিন হয়ে গেল, তবু নিবারণবাবু ঘরে ঢুকেই মাঝে মাঝে চমকে ওঠেন। যেন মনে হয়, চৌকিতে মিনুর মা শুয়ে আছে। অফিস যেতে হবে। নাড়ু-সন্তুর পড়ার একটু খোঁজ নিয়েই স্নানে ছোটেন।

দুপুরগুলো নিয়ে মিনুর বড় সমস্যা। শুয়ে বসে গড়িয়ে আর ক'দিন কাটে এ এক আশ্চর্য বন্দী জীবন। সকাল থেকে তাড়াহুড়ো, সংসারের কাজ। নাড়ু-সন্তু স্কুলে চলে গেল, বাবা অফিসে। তারপর খোকন খেয়ে শুয়ে পড়ল। মিনুর অফুরন্ত অবসর—কোন কাজ নেই। বাড়িতে বসে যেন জেলখানার জীবন।

অশোকের ব্যাগ থেকে ক্রান্তিকাল কাগজটা বার করে মিনু। রাজু ওকে ঠিকানাটা এনে দিয়েছিল। মিনুই কপি করে পোষ্ট করে দিয়েছিল। পরের মাসের ক্রান্তিকালের জন্য অপেক্ষা করেছিল। রাজু যেদিন এসে খবর দিল, বেরোয় নি অশোকের লেখা, খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মিনুর তারপর মনে হয়েছিল, ও বোধ হয় ঠিক ভাল কবিতা নির্বাচন করে পাঠাতে পারে নি।

তাবপব থেকেই ভেবেছে, আবও দুতিনটে এক সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে। বাজু বলেছে, আগে আমদেব মানসিকতাব অনেক কাগজ ছিল। এখন মুর্শিদাবাদ থেকে ঐ ক্রান্তিকালই যা বেরুচ্ছে। গত সপ্তাহে এ-মাসেব কাগজটা দিযে গেছে বাজু। অশোকেব লেখাটা ছাপাব অক্ষবে দেখে এত খুশী লাগছে মিনুব, যদিও অশোক নামে বেবোয নি। বাজু বলেছিল, ওব আসল নামেই দিতে। কাবণ, আব তো নাম গোপন কবাব দবকাব নেই। কিন্তু মিনু এখনও অশোকেব কথাই ভাবে, ও নামেই মানুষটাকে জানে ও। মিনুব ভাবতে ভাল লাগে, কত হাজাব হাজাব মানুষেব হাতে আজ অশোকেব কথা পৌছে গেছে। আবো কয়েকটা কবিতা কপি কবতে বসে।

অশোক বলেছিল— আমি একটা উপন্যাস লিখবো। তোমাব কথা।

—যাঃ, উপন্যাসেব নাযিকাবা তো সব সুন্দবী হয়। আমাব মত লম্বা গলা হয নায়িকাদেব, না নাক বোচা হয ?

চোখ ছল ছল কবে ওঠে মিনুব। অশোক তো আব ওব কাছাকাছি থাকত না। মাসে দু'মাসে একদিনেব জন্যে আসতো। তাই এখনও মিনুব হঠাৎ হঠাৎ মনে হয, বেশ কয়েক মাস হযত আসতেই পাবছেনা কাজেব চাপে। তাতে কী হযেছে, হঠাৎ একদিন এসে বলবে—কী কমবেড, এতদিন আসতে পাবি নি বলে বাগ কবনি তো ?

সাবা পৃথিবীটা ঝাপসা হয়ে আসে। অশোকেব খাতাব ওপব মাথা বেখে কোথায় হাবিয়ে যায মিনু।

খোকন ঘুম থেকে ওঠে।—দিদি, এই দিদি খিদে পেয়েছে।

ঘুম ভেঙে যায মিনুব। তাই তো, বিকেল হতে চলল। আবাব সেই রুটিন। রুটি বেল, তবকাবি কোটো, বাসন মাজ, ঘব ঝাঁট দাও। ওঃ, মুক্তি নেই।

খোকন বাবান্দায় বসে নিজেও মুডি খায় আব সজনেব ডালে-বসা কাকদেব ডেকে ডেকে খাওয়ায়। সুজিতদাব মা পাত্রী খুঁজছে। ববিবাব সুজিতদা আসবে। বাবা তো নিজেব ইছে প্রকাশ কবেইছে। কিন্তু সুজিতদা কি এখনও ? সুজিতদা কি জানে যে অশোককে ? কেউই জানে না, সুজিতদা কোত্থেকে জানবে।

মিনু বাবান্দায় খোকনের পাশে গিয়ে বসে। হাই তোলে বাইবের দরজার দিকে তাকায়। অশোক আর কোন দিন আসবে না। আজকে কী বার যেন, বুধবার।

—চিঠি।

পিওন দরজার বেড়ার বাতার ফাঁকে গুঁজে দিয়ে চলে যায়। মিনু ইনল্যাণ্ডের ওপরে হাতের লেখাটা চিনতে পারে না। অথচ ওরই নামে চিঠি। খুলে পড়তে শুরু করে।

'মিনু,

হঠাৎ চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবি। কে বুঝতে পারছিস না তো, আমি জহরদা। বহুদিন ধরেই তোকে একটা চিঠি লেখার কথা ভেবেছি। লেখা আর হয়ে ওঠে নি। সোনা, মানে তোর সোনাকাকু ক'দিন হল ছাড়া পেয়েছে। ওর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তোদের কথা হচ্ছিল। তাতেই ঠিক করে ফেললাম, তোকে একটা চিঠি এবার লিখবোই।'

মিনু ভীষণ অবাক হয়। ভালও লাগে, সেই জহরদা, সেই সোনাকাকু।

'মাসীমার অবর্তমানে নিশ্চয়ই সংসার তোর কাঁধে। মেসোমশাই, পরেশ নাড়ু, সন্তু আর ছোটটার যেন কী নাম ভুলে গিয়েছি, আশা করি ভাল আছে

আমরা সবাই একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে এলাম। উপলব্ধি করলাম, সমাজ-বিকাশের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে গুণগত পরিবর্তনের অবস্থা দেখা দেয়। আমরা শক্তি সংহত না করতে পারলে শত্রুরা তাদের মুষ্টি আরও শক্ত করে নিঙড়ে নেয়। সামনে হয়ত আরও দুর্দিন আসছে। মানুষের সভ্যতার বিকাশের নিয়মটাই এই রকম—চক্রবৎ পরিবর্তনেও নয়, সরল রেখাতেও নয়। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর সে পথ—আঁকা-বাঁকা। ভুল আমরা করেছি, সংশোধনের দায়িত্বও আমাদেরই।

'ক্রান্তিকালে' গৌতমের কবিতাটা পড়েছি। ভাল লেগেছে। অজস্র ধন্যবাদ কমরেড।

আমাদের আগেও হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ছিল, আগামী হাজার হাজার বছর থাকবে। আমাদের মত লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তি-জীবনের ছোট ছোট দুঃখ-সুখ—বহতা নদীর শুধু ঢেউয়ের মত। গত বছর মহানন্দায় দেখেছিলাম নদীগর্ভে ভীষণ এক চর। মহানন্দাও নিশ্চই থেমে যাবে না, আগামী কোন এক ভরা বর্ষায় গতিপথ পরিবর্তন করবে।

অগণিত মানুষ এই ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে তোলার পথ খুঁজতে গিয়ে চরম আত্মত্যাগ করেছে, এ-কথা যেন আমরা না ভুলি। কমরেড, আমরা যেন তুলে নিতে পারি তাদের আরব্ধ কাজ।

শিগ্‌গীরই মালদা যাওয়ার ইচ্ছে আছে। অভিনন্দন সহ

জহরদা'

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাধার বাঁধ ভেঙে গতিপথ বদলে যাচ্ছে। মিনু অশোকের লেখার খাতাটা যত্ন করে তুলে রাখে। অশোকের একটা শেষ না করে যাওয়া গল্প আছে—সূর্যশিকার। রাজু বলছিল, কলকাতা থেকে নাকি একট নতুন কাগজ বেরোচ্ছে। সেটাতেই পাঠাবে গল্পটা। যদি ওরা কেউ গল্পটা শেষ করতে পারেন।